ছোটদের

শহীদ হাসানুল বান্না

নূর মোহাম্মদ মল্লিক

ছোটদের

শহীদ হাসানুল বান্না

নূর মোহাম্মদ মল্লিক

আরজু পাবলিকেশন্স
৬০/ডি পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০

পরিবেশনায়

ঢাকা বুক কর্ণার	খন্দকার প্রকাশনী
৬০/ডি পুরানা পল্টন	৫০, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০	ঢাকা-১১০০
মোবাঃ ০১৭১১০৩০৭১৬	মোবাঃ ০১৭১১৯৬৬২২৯

ছোটদের শহীদ হাসানুল বান্না

নূর মোহাম্মদ মল্লিক

প্রকাশক

মাওলানা আমীনুল ইসলাম

শো-রুম

ঢাকা বুক কর্ণার ও এ, এ, অডিও ভিশন

৬০/ডি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রথম প্রকাশ : নভেঃ ২০০২ ইং

তৃতীয় প্রকাশ : ফেব্রুঃ ২০০৯ ইং

কম্পোজ : প্রফেসর'স কম্পিউটার

মুদ্রণে

আলা আকাবা প্রিন্টার্স

৩৬ শিরিশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৬০ .০০ টাকা মাত্র

Chotodear Shohid Hasanul Banna by Noor Mohammad Mollik

Published by Maulana Aminul Islam

60/D Purana Palton Dhaka-1000

Price : Tk. .0.00 only

লেখকের কথা

শহীদ হাসানুল বান্না– একটি সংগ্রামী জীবনের নাম। মিসরের নীল নদের পাদদেশে যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি চরিত্র, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন সবাইকে। শিক্ষা জীবনের ধাপ পেরিয়ে শিক্ষাকতার মহান পেশাকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। ছাত্রজীবনে পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি করেছিলেন ঘড়ি মেরামতের কাজ।

শহীদ হাসানুল বান্না সারাটি জীবন মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডেকেছেন। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর উপর তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি মানুষকে দাওয়াত দিয়েছিলেন কপিশপে, মসজিদে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং হাটে-বাজারে। মুসলমানদের আল্লাহ্‌র পথে আন্দোলন করার জন্য তিনি ডাক দিয়েছেন। ইসলাম শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব কোন ধর্ম নয়, বরং পরিপূর্ণ জীবন বিধান। একথা তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। তিনি গঠন করেছেন 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন।'

তার এই দাওয়াতে ও সংগঠনের কাজকে তৎকালীন শাসক গোষ্ঠি মেনে নিতে পারেনি কিছুতেই। তাই ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী তাকে প্রকাশ্য রাজপথে গুলী করে শহীদ করা হয়। শহীদ হাসানুল বান্না আজ নেই। কিন্তু তার রেখে যাওয়া কাজ ও জীবনাদর্শ আমাদের নিকট বিদ্যমান।

তার এই জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে আমাদেরকে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শহীদ হাসানুল বান্নার মতই শপথ নিতে হবে শহীদ হবার।

নূর মোহাম্মদ মল্লিক
৫৬ সিদ্বেশীরী লেন
ঢাকা।

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ।

ছোটদের শহীদ হাসানুল বান্না বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আশা করি, এ বইটি বাংলা ভাষাভাষী কিশোর, তরুণ ও যুবকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে। মূলত: ছোটদের উদ্দেশ্যে এ বই লিখিত হলেও বড়রাও এ বই হতে শহীদ হাসানুল বান্নার সংগ্রামী জীবনের অনেক অজানা বিষয় জানতে পারবে।

বইটি পড়ে যদি কেউ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার সামান্যতম অনুপ্রেরণা পায় তবে আমাদের এই শ্রম স্বার্থক হবে আশা করছি।

মাওলানা আমিনুল ইসলাম
ঢাকা বুক কর্ণার

সূচীপাতা

ছোটদের
শহীদ হাসানুল বান্না

মিশরের ছোটছেলে হাসান

দেশের নাম মিসর। সে দেশের এক ছেলে। নাম তার হাসান। আলেম পরিবারে তার জন্ম। ছোট বেলা থেকে আল্লাহর বাণী আর রসূলের হাদিসের মধ্যে মানুষ। তার আব্বা ঘড়ির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। আব্বার কাছে পবিত্র কোরআন শেখেন আর ঘড়ির কাজ করা দেখেন।

হাসান আর পাঁচটা ছেলের মত হেসে খেলে জীবন কাটতে ভালবাসেন না। তিনি ভাল থাকতে চান আর অপরেও যাতে ভাল থাকে সে চেষ্টা করেন। ছোট বেলা থেকেই অন্যায় আর খারাপ কাজের প্রতি তার প্রচন্ড ঘৃনা। তিনি অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেন। সমাজে যাতে কেউ খারাপ পথে না যায় তিনি সে চেষ্টা চালান।

নীল নদের সেই মজার ঘটনা

মিসর দেশের উপর দিয়ে নীল নদ বয়ে গেছে। নীল নদে ভেসে চলে কত রকমের পাল তোলা নৌকা। এসব নৌকা তৈরীর একটা কেন্দ্র ছিল নদীর তীরে। জায়গার নাম মাহমুদিয়া। সেখানে নৌকা তৈরী হত। একবার হাসান স্কুলে যাওয়ার পথে একটা নৌকার মাস্তুলে খুব খারাপ একটি মূর্তি দেখলেন। ন্যাংটা এই মূর্তি দেখে তিনি মনে খুবই দুঃখ পেলেন। তিনি চাইলেন মূর্তিটি সরাতে। কিন্তু তার কথাতো সেই নৌকার লোকেরা শুনবেনা। তাই তিনি ভাবলেন পুলিশকে জানালে হয়তো এর একটা বিহিত করা যাবে। নিকটেই রয়েছে পুলিশের একটি ফাঁড়ি। তিনি ছুটে গেলেন সেখানে। ফাঁড়িতে বসেছিলেন পুলিশের ইনচার্জ। তিনি ছোট একটি ছেলেকে তার কাছে আসতে দেখে তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ

-কি নাম তোমার খোকা?

-আমার নাম হাসান।

-কোথায় থাক?

-নিকটেই।

-তুমি কিছু বলতে চাও?

-জ্বী হ্যাঁ।

-বল- তোমার কোন ভয় নেই।

-নদীর তীরে একটা নৌকায় খুব খারাপ একটা মূর্তি টাংগিয়ে রেখেছে। ওটা সরিয়ে ফেললে ভাল হয়।

-ঠিক আছে। আমি নিজেই যাচ্ছি।

-চল।

হাসানের সাথে পুলিশের ইনচার্জ নদীর তীরে গেলেন। হাসান তাকে খারাপ মূর্তিটা দেখালো। তখন ইনচার্জ নৌকার মালিককে বেশ ধমকের সুরে মূর্তিটা সরিয়ে ফেলতে বললেন। লোকটি পুলিশ দেখে ভয় পেয়ে তখনই মূর্তিটা সরিয়ে ফেলল। এতে বালক হাসানের মুখে হাসি ফুটলো। তিনি খুব খুশী হয়ে স্কুলে ফিরলেন। এদিকে পুলিশের ইনচার্জ এঘটনায় খুবই অবাক হলেন। তিনি এই সৎ আর ভাল ছেলেটির ব্যাপারে আরো মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন। তিনি পরদিন হাসানের স্কুলে গিয়ে তার প্রধান শিক্ষককে আগের দিনের ঘটনা খুলে বললেন। প্রধান শিক্ষক মুহম্মদ আফেন্দি এ ঘটনা শুনে খুব খুশী হলেন। তার স্কুলে হাসানের মত একটা ভাল ছেলে আছে জেনে তিনি গৌরব বোধ করলেন। তিনি হাসানকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে তার সৎ সাহসের জন্য তাকে বাহবা দিলেন। আর স্কুলের সব ছাত্রকে ডেকে এ ঘটনা জানালেন।

সমিতির নেতা হাসানুল বান্না

হাসানের স্কুলের অংকের শিক্ষক ছিলেন একজন ভাল লোক। তাঁর নাম মুহাম্মদ আফেন্দি আব্দুল খালেক। তিনি ছাত্রদের চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতিটি উঁচু ক্লাশের ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হত। তিনি এই সমিতিকে সহায়তা দিতেন। সবার সাথে ভাল ব্যবহার করাই ছিল এ সমিতির মূল লক্ষ্য। কোন ছাত্র যদি তার ভাইকে গালি দেয় তবে তাকে এক মিলিয়াম জরিমানা দিতে হবে। মিলিয়াম হচ্ছে মিসর দেশের মুদ্রার নাম। আর ক্রোশ হচ্ছে ওদের টাকা। কোন ছাত্র তার আব্বাকে গালি দিলে তাকে দু' মিলিয়াম জরিমানা দিতে হবে। মায়ের সঙ্গে বেয়াদবি করলে এক ক্রোশ জরিমানা দিতে হবে। ইসলাম সম্পর্কে আজে বাজে কথা বললে তাকে দু'ক্রোশ জরিমানা দিতে হবে। কারো সঙ্গে ঝগড়া- ফ্যাসাদ করলে দু'ক্রোশ জরিমানা দিতে হবে। জরিমানার অর্থ ভাল কাজে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সমিতির সদস্যরা একে অন্যকে ভাল কাজে উৎসাহ দেবে। সকলে আল্লাহর কথা মেনে চলবে। আব্বা আম্মা যা

বলবেন তাই করবে। বড়দের সম্মান করবে। হাসান এই সমিতির সদস্য হলেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনিই হলেন এই সমিতির আসল নেতা। তাঁর চমৎকার ব্যবহার আর সুন্দর কথাবার্তায় সকলেই মুগ্ধ। তাই সব ছাত্র মিলে তাকেই সভাপতি করলো। সমিতির অনেক সদস্য সমিতির লক্ষ্য অনুযায়ী চলেনি। একারণে তাদের জরিমানা দিতে হল। ফলে সমিতির কাছে অনেক অর্থ জমা হল। এ থেকে কিছুটা ব্যয় করা হয় সমিতির একজন সদস্যের বিদায়ী অনুষ্ঠানে। তার নাম লবীব ইস্কান্দার। তার ভাই ছিলেন ডাক্তার। তিনি অন্য জায়গায় বদলী হন। ফলে লবীবকে বাধ্য হয়ে ভাইয়ের সাথে চলে যেতে হয়। আর কিছু অর্থ একজন অসহায় লোকের দাফন কাফনের জন্য খরচ করা হয়। লোকটির লাশ নীলনদের পানিতে ভেসে আসে।

ইমাম সাহেবকে চিঠি

হাসানদের স্কুলের কাছে ছিল একটি মসজিদ। অধিকাংশ ছাত্রই সেখানে যোহরের নামাজ আদায় করতো। মসজিদের ইমাম ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ। একদিন তিনি দেখেন একজন ছাত্র আযান দিচ্ছে। আযান শেষ হলে ছাত্ররা জামায়াত করে নামাজ আদায় করলো। ইমাম সাহেবের ভয় হল - ছাত্ররা এভাবে মসজিদে এলে মসজিদের পানি বেশী খরচ হতে পারে আর চাটাইও ভেঙ্গে যেতে পারে। কাজেই নামাজ শেষ হলে তিনি জোর করে ছাত্রদের মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। হাসান এতে খুবই কষ্ট পেলেন। কেননা আল্লাহ পাক এটা পছন্দ করেন না। কেউ মসজিদে এবাদত করতে গেলে তাকে জোর করে বের করা উচিত নয়। হাসান ছোটবেলা থেকে পবিত্র কোরআন পড়েছেন। তিনি তার অর্থও শিখেছেন। এ ব্যাপারে কোরআনের একটি আয়াতের কথা তার মনে পড়লো। সুরা আল আনআমের ৫২নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, 'যারা নিজের প্রভুকে খুশি করার জন্যে সকাল সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে, তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেনা। তাদের হিসাব নেয়া তোমার দায়িত্ব নয় আর তোমার হিসাব নেওয়াও তাদের কাজ নয়। তাদেরকে তাড়িয়ে দিলে তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' হাসান মসজিদের ইমাম শায়খ মুহাম্মদ সাঈদের কাছে একটা চিঠি লিখলেন। চিঠিতে এই আয়াতেরও উল্লেখ করলেন। চিঠিটা তাঁর কাছে বিয়ারিং করে পাঠানো হল। এ চিঠি পেয়ে ইমাম সাহেব বুঝতে পারলেন কে তার কাছে এই চিঠি লিখেছেন। তিনি হাসানের আব্বার সাথে দেখা করলেন। আব্বা সব কথা শুনে বললেন, ছোটদের সাথে ভাল ব্যবহার করা উচিত। ইমাম সাহেব

নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। এ ঘটনার পর থেকে তিনি ছোটদের সাথে আর খারাপ ব্যবহার করেননি। বরং সব সময় তাদের সাথে হাসি খুশী ব্যবহার করতেন। তবে তিনি হাসানকে ডেকে বললেন,

-ঠিক আছে তোমরা যতক্ষণ খুশী মসজিদে থাকতে পার। তবে একটা শর্ত আছে ।

-আলহামদুলিল্লাহ্। দয়া করে আপনার শর্তটা বলুন।

-মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে ট্যাংকে পানি ভরে দেবে আর চ্যাটাই ভেঙ্গে ফেললে চাঁদা তুলে চ্যাটাই কিনে দিতে হবে।

-ঠিক আছে আমরা রাজি। এ দুটি শর্ত মেনে চলবো।

হাসান স্কুলের পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করেন। তিনি তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন। অন্যায় কাজের প্রতিবাদ জানিয়ে তা বন্ধ করার জন্যই এ সমিতি গঠন করা হয়।এ সমিতির নাম রাখেন হারাম প্রতিরোধ সমিতি। এ সমিতির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন, মোহাম্মদ আলী বোদাইর, লবীব আফেন্দি নাওয়ার,আব্দুল মুতাআল আফেন্দি ও আব্দুর রহমান। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ শিক্ষক, কেউ ব্যবসায়ী হন। সদস্যদের প্রতি সপ্তাহে ৫ মিলিয়াম থেকে ১০ মিলিয়াম চাঁদা দিতে হত। যারা সঠিক ভাবে নামায আদায় করেনা বা রমযান মাসে রোজা রাখে না তাদের কাছেও চিঠি দেয়া হত। কোন পুরুষকে সোনার হার বা আংটি বা সোনার অন্য কোন জিনিস ব্যবহার করতে দেখলে পত্র মারফত তাকে সে কাজ থেকে বারণ করা হত। ছোট বড় সকলের কাছেই সমিতির পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে হারাম কাজ ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হত। এ ভাবে হাসান তার বন্ধুদের সাথে নিয়ে সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন।

হোছাফি ইখওয়ানের মাহফিলে হাসান

হাসান যেখানে থাকেন তার কাছে একটি মসজিদ আছে। সেখানে একদল লোক প্রতিদিন এশার নামাজের পর আল্লাহর জিকির করেন। এরাই হচ্ছেন হোছাফি ইখওয়ান। হাসানও এই জিকিরের মাহফিলে শরীক হন। ছোট বড় সব বয়সের লোক আর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সব ধরনের মানুষ এতে যোগ দেয়। এতে শিশুরাও আসে। এখানে বড়রা শিশুদের খুব আদর করেন। হাসান নিয়মিত এই মাহফিলে আসেন। এখানে হেছাফী ইখওয়ানদের অনেকের সাথে তাঁর গভীর

বন্ধুত্ব হয়। এদের তিন জন ছিলেন, শায়খ শালবীর রিজাল, শায়খ মুহাম্মদ আবু শোশা এবং শায়খ মুহাম্মদ ওসমান।

শায়খ হাসনাইন আল হোছাফী হচ্ছেন হোচ্ছাফী এখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা। হাসানের বয়স যখন চার বছর তখন তাঁর ইন্তেকাল হয়। এ কারণে হাসান তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাননি। কিন্তু তাতে কি? তিনি শায়খ হোছাফীর লেখা বই পত্র পড়া শুরু করলেন। বই পড়েই তিনি তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানলেন। শায়খ হোছাফী কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করে আলেম হন। তিনি খুবই মনযোগ সহকারে ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেন। তিনি বেশীরভাগ সময় আল্লাহর জিকির করতেন । তিনি রসূল (সাঃ) এর অনুসরন করতেন। দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের প্রতি তিনি বেশী খেয়াল রাখতেন। তাঁর সঙ্গী সাথীরা সকলেই বলেছেন, শায়খ হোছাফী ফরজ, সুন্নত ও নফল খুব ভাল ভাবে আদায় করতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এভাবে চলেছেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর দিকেও ডাকতেন। তিনি সব সময় শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব আর রসূল (সাঃ) এর সুন্নাহকেই গ্রহণ করতেন। তিনি ভাল কাজের আদেশ দিতেন আর মন্দ কাজ থেকে বারণ করতেন। এ ব্যাপারে তিনি কোন আপস করেননি। এমনকি বড় বড় দরবারেও তিনি সত্য কথা বলতে ভয় পেতেন না। হাসান শায়খ হোছাফীর এই গুন জানতে পেরে মুগ্ধ হন। রিয়াজ পাশা তখন মিসরের প্রধানমন্ত্রী। একবার কোন কারণে শায়খ হোছাফী তাঁর সাথে দেখা করতে যান। এমন সময় পাশার কাছে একজন আলেম আসেন। তিনি পাশাকে সম্মান দেখানোর জন্যে এমন ভাবে ঝুঁকে পড়েন যেন রুকু করছেন। কোন মানুষকে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মানুষের সামনে এভাবে ঝুঁকতে দেখে তিনি খুবই রেগে গেলেন। তিনি কড়া ভাষায় সেই আলেমকে বললেন, মাওলানা সাহেব- সোজা হয়ে দাঁড়ান। আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত করা জায়েজ নেই। আলেম আর প্রধানমন্ত্রী রিযাজ পাশা এঘটনায় খুবই অবাক হয়ে গেলেন। তাদের মুখে কোন কথা নেই। বলারই বা কি আছে। শায়খ হোছাফী তো সত্যি কথাই বলেছেন। আর তাঁর মত আল্লাহ ওয়ালা লোকের পক্ষেই এরকম সাহস দেখানো সম্ভব। আলেমকে চুপ থাকতে দেখে শায়খ হোছাফী আরো বললেন,

-আপনি একজন আলেম। আপনি একথা খুব ভাল করেই জানেন। আর

ইসলাম সম্পর্কে জানার পরেও যদি আপনি তার ওপর আমল না করেন তাতে নিজের দ্বীন আর জ্ঞানকে কলঙ্কিত করা হবে। তা'হলে আল্লাহ আপনাকে কলংকিত করবেন।

এমন সময় প্রধান মন্ত্রীর কাছে তাঁর একজন বন্ধু এলেন। সেই বন্ধুর হাতে ছিল সোনার আংটি। হাতে ছিল একটি লাঠি যার হাতল ছিল সোনার তৈরী। এটা দেখে শায়খ হোছাফী বললেন,

-প্রিয় ভাই, এভাবে সোনার ব্যবহার পুরুষের জন্য হারাম। সোনার জিনিস পরা মেয়েদের জন্য হালাল। কাজেই আপনি এদু'টিকে কোন মেয়েকে দিয়ে দিন।

একবার শায়খ হোছাফী মিসরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কর্মকর্তা খেদিভ তাওফিক পাশার কাছে গেলেন। তিনি বেশ জোর গলায় খেদিভকে সালাম দিলেন। খেদিভ হাতের ইশারায় সালামের জবাব দেন। কিন্তু ইসলামের নির্দেশ, সালামের জবাব পরিষ্কার ভাবে দিতে হবে যাতে বোধগম্য হয়। কিন্তু খেদিভ তা'করেননি। এতে শায়খ হোছাফী বললেন,

- সালামের মতই বা তার চেয়ে উত্তম জবাব দেয়া উচিত। কেবল হাতের ইশারায় জবাব দেয়া জায়েজ নয়।

একথা শুনে খেদিভ আবার মুখে সালামের জবাব দিলেন। তিনি শায়খ হোছাফীর সত্য প্রিয়তার জন্য তাঁকে বললেন,

- আলহামদুলিল্লাহ। আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। সত্য কথা বলতে আপনি ভয় পাননি এতে আপনাকে জানাই মোবারকবাদ।

জরিপ বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে একজন ছিলেন শায়খ হোছাফীর অনুসারী। একদিন শায়খ হোছাফী তার অফিসে গেলেন। গিয়ে দেখেন একটি মূর্তি। জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? কর্মচারীটি বললেন, এটা একটা মূর্তি। কাজের সময় দরকার হয়। শায়খ বললেন, এটা হারাম। তিনি মূর্তিটি নিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন। সে সময় একজন ইংরেজ পরিদর্শক সেখানে আসেন। তিনি মূর্তি ভাঙ্গার ব্যাপারে তর্ক বিতর্ক শুরু করেন। শায়খ তাকে সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন, খাঁটি তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যেই ইসলাম এসেছে। ইসলাম মূর্তি পুজা খতম করতে চায়। পরিদর্শক মনে করেছিলেন, ইসলামেও মূর্তি পূজার সুযোগ আছে। তিনি শায়খের কথা মেনে নিলেন এবং তার প্রশংসা করলেন।

হাসানের বায়াত গ্রহণ

মাহমুদিয়ায় ব্যবসা করতেন শায়খ মোহাম্মদ আবুশোশা। তিনি একজন

ভাল লোক ছিলেন। বেশ কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে তিনি কবরস্থানে যেতেন। সেখানে সুন্নত তরিকা মোতাবেক কবর জিয়ারত করে মসজিদে বসে ওযীফা পাঠ করতেন। শায়খ মোহাম্মদ আবু শোশা ছাত্রদের ওলী আল্লাহদের জীবন কথা শোনাতেন। এসব কাহিনী শুনে তাদের অন্তর নরম হয়ে যেত আর চোখ থেকে পানি পড়তে থাকতো। তিনি খোঁড়া কবর দেখিয়ে বলতেন, শেষ পর্যন্ত এই কবরেই আমাদের ঠাঁই নিতে হবে। তিনি কবরের অন্ধকার আর ভয়াবহ অবস্থার কথা আলোচনা করতেন। শায়খ আবু শোশা এসময় নিজেও অঝোরে কাঁদতেন। এতে হাসান ও অন্যান্য ছাত্রদের চোখ থেকে পানি বের হত। অন্যান্যদের সাথে হাসানও বিনয় ও নম্রতার সাথে তাওবা করতেন। হাসান শায়খ হোছাফীর ভক্ত ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি দামানহুরে গিয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুলে ভর্তি হন। দামানহুর শহরেই রয়েছে শায়খ হোছাফীর কবর। হাসান নিয়মিতভাবে সেই কবর জিয়ারতে যেতেন। এসময় হাসান সেখানকার হোছাফী এখওয়ানদের সাথে তাওবা মসজিদে গিয়ে জিকরের মাহফিলে বসতেন। এখানকার মাহফিলের পরিচালক ছিলেন শায়খ বাসইউনী। তিনি একজন ভাল লোক। ব্যবসা করেন। তার কাছে শায়খ হোছাফীর কাছে বায়াত করবার জন্য তিনি আবেদন জানান। কোন কামেল আল্লাহর ওলীর কথামত চলার প্রতিশ্রুতি দানের নাম বায়াত হওয়া। কামেল ওলীগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কে সঠিক ভাবে মেনে চলেন এবং তাদের অনুসারীদেরও সেভাবে চলতে বলেন। শায়খ বাসইউনী হাসানের আবেদন মঞ্জুর করলেন।

সৈয়দ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী

একদিন শায়খ হোছাফী (রহঃ) এর পুত্র সৈয়দ আব্দুল ওয়াহাব হোছাফী দামানহুরে এলেন। এখবর পেয়ে হাসান খুব খুশী। তিনি সৈয়দ আব্দুল ওয়াহাব হোছাফীর হাতে বায়াত করেন। তাঁর সাথে থেকে হাসান আরো ভাল হতে পারলেন। আব্দুল ওয়াহাব হোছাফী ছিলেন পূত পবিত্র চরিত্রের লোক। তিনি লেনদেন ও আচার ব্যবহারে সুন্দর ছিলেন। মানুষের ধন- দৌলতের প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিলনা। তিনি মনের চোখে অনেক সময় অনেক কিছু দেখতে পেতেন। এটাকে বলে কাশ্‌ফ হওয়া। অনেক ওলী আল্লাহর কাশ্‌ফ হওয়া নিয়ে অনেক ঘটনা রয়েছে। এটা কোন আজগুবি ঘটনা নয়। বরং বাস্তব সত্য কথা। কেননা যে আল্লাহর আপন হয়ে যায়- তার দেখা বলা ও চলা-সব কিছুই আল্লাহর মর্জি মাফিক হয়। এসময় তার পক্ষে অনেক কিছু দেখা ও জানা সম্ভব হয়।

এক মজলিসে সৈয়দ আব্দুল ওয়াহাব হোছাফী হাসান এবং ওস্তাদ আহমদ সাকারীর উদ্দেশ্যে বললেন, আমি এমন অনেক আলামত দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ পাক অনেক লোকের অন্তর তোমাদের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন, অনেক লোককে তোমাদের সঙ্গী করবেন। যেসব লোক তোমাদের আশেপাশে জড়ো হবে তাদের সময় সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি তাদের সময়কে ভাল কাজে ব্যয় করেছিলে না সময়ের অপচয় করেছিলে। ভাল কাজে ব্যয় করলে তারা পুরস্কার পাবে আর তোমরাও পাবে। আর সময়ের অপচয় করলে তোমরাও ধরা পড়বে এবং তারাও। সৈয়দ সাহেব হাসান ও ওস্তাদ আহম্মদ সাকারীকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছিলেন পরবর্তীকালে তাই ঘটেছিল। দু'জনেই লক্ষ লক্ষ লোকের নেতা হয়েছিলেন। তাঁরা তাদের অনুসারীদের সময়কে ভাল কাজে ব্যয় করতে সাহায্য করেছিলেন।

আল্লাহ্‌র এবাদতে হাসান

হাসান দামানহুরে থাকাকালে আল্লাহর এবাদতে ডুবে থাকেন। এসময় মিসরের মানুষ ইংরেজদের বিরুদ্ধে গন অভ্যুত্থান শুরু করে এবং মিসরের স্বাধীনতা চায়। ফলে বৃটেন মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। গণ অভ্যুত্থান যখন শুরু হয় তখন হাসানের বয়স ছিল ১৪ বছর। আর যখন শেষ হয় তখন বয়স ছিল ১৭ বছর। এসময় তিনি ভাল লোকদের মজলিসে বসতেন। অলী আল্লাহদের কাছে থাকতেন। তাঁরা হাসানকে সবসময় ভাল কাজে উৎসাহিত করতেন।

দামানহুরে মসজিদুল জায়শ ও ফলাকা পুলের কাছে হাতাতেবা মসজিদে হাসান নিয়মিত যেতেন। তিনি কখনো কখনো সারারাত মসজিদে এতেকাফ করতেন। তিনি সামান্য খাওয়া দাওয়া সেরে আল্লাহর জিকর করতেন। এরপর ঘন্টা দু'য়েক ঘুমিয়ে ঠিক মধ্যরাতে তাহাজ্জুতের নামাজের জন্য উঠতেন। আর ফজরের নামাজ পর্যন্ত তাহাজ্জুত নামাজ রত থাকতেন। ফজরের নামাজের পর ওজিফা পড়তেন। তার পর স্কুলে যেতেন।

আল্লাহ্‌র অলীর মাজার জিয়ারত

শুক্রবার ছুটির দিন। এদিন দামানহুরে থাকলে হাসান আশপাশের কোন না কোন অলী আল্লাহর মাজার জিয়ারত করতে যেতেন। ওসুকে যাওয়ার জন্যে ফজরের নামাজের পর পায়ে হেঁটে রওনা হতেন এবং সকাল আটটায় সেখানে পৌছতেন। তিন ঘন্টা হেঁটে ২০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতেন। জিয়ারতের

পর সেখানে জুমার নামাজ পড়তেন। হাসান দুপুরের খাবার সেখানে খেয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। পরে আসরের নামাজ পড়ে দামানহুরের উদ্দেশ্যে রওনা হতেন।

পোশাকের ব্যাপারে হাসান

হাসান ছিলেন তাঁর ক্লাশের ফার্স্ট বয়। তিনি পরীক্ষায় সব সময় প্রথম হতেন। একারণে তাঁকে স্কুলের প্রিন্সিপালের রুমে গিয়ে অনুপস্থিত ছাত্রদের তালিকা দিয়ে আসতে হত। একদিন তিনি অনুপস্থিত ছাত্রদের তালিকা নিয়ে প্রিন্সিপালের রুমে গেছেন। সেই রুমে তখন ছিলেন শিক্ষা বিভাগের ডি পি আই ওস্তাদ সৈয়দ রাগিব। হাসানের পোশাকের দিকে তাঁর নজর পড়ে। কেননা হাসানের মাথায় ছিল পাগড়ি, হজ্বের সময় যে রকম জুতা পরা হয় তাই ছিল তার পায়ে। পরনে ছিল ঢিলা ঢালা জামা। আর জামার উপর ছিল কালো রুমাল। ডিপি আই সাহেব হাসানের দিকে তাকিয়ে বললেন,

- তুমি কি এই স্কুলের ছাত্র?

- জ্বী।

- তুমি এমন পোশাক কেন পরেছো?

- কেননা এ ধরনের পোশাক পরা সুন্নত।

- তুমি কি অন্য সব সুন্নত মেনে চলছো- শুধুমাত্র এই একটি সুন্নতই বাকী রয়ে গেছে?

- না। অন্য সুন্নতগুলো তেমন করে পালন করতে পারছি না। অনেক ভুল ত্রুটি হচ্ছে। তবে আমার সাধ্যমত মেনে চলছি।

- এমন অদ্ভুত পোশাক পরে আসায় তুমি স্কুলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছো।

- তা' কিভাবে? কেননা নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হওয়া আর নিয়মিত পাঠ মুখস্ত করাই হচ্ছে স্কুলের শৃঙ্খলা। আমি স্কুলে কখনোই অনুপস্থিত থাকিনা। আমি নিয়মিত পাঠ মুখস্থ করি। আমি আমার সেকশনে প্রথম। তাহলে স্কুলের শৃঙ্খলা কিভাবে ভংগ হলো?

- দেখ, তুমি যখন এই স্কুল থেকে পাশ করে বের হবে এবং এই ধরনের পোশাক পরবে তখন শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষক হিসেবে তোমাকে গ্রহণ করবে না। কারণ তুমি পোশাকের কারণে ছাত্রদের কাছে হাসি তামাশার পাত্র হবে।

- এখনো সে সময় হয়নি। সময় হলে শিক্ষা অধিদফতর তার সিদ্ধান্তের

ব্যাপারে স্বাধীন থাকবে আর আমিও আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীন থাকবো। জীবিকা কারো হাতে নেই। এটা কেবল আল্লাহর হাতে।

ডিপি আই সাহেব চুপ করে গেলেন। প্রিন্সিপাল সাহেব এসময় অন্য কথা জুড়লেন। তিনি ডিপি আই এর কাছে হাসানের পরিচয় দিলেন। আর হাসানকে ক্লাসে যেতে বললেন।

বৃটিশ খেদাও আন্দোলন

১৯১৯ সাল। মিসর জুড়ে চলছে তীব্র আন্দোলন। বৃটিশ রাজ খতম করতে হবে আর মিসরকে স্বাধীন করতে হবে। এ সময় সর্বাত্মক হরতালে সারা দেশ অচল। দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল চলছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসব মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইংরেজ সৈন্যরা গ্রামে গঞ্জে আর শহর জনপদে শিবির স্থাপন করে জনগনের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে জনগণ এসময় নিজেদের ... থেকে ন্যাশনাল গার্ড গঠন করে। ন্যাশনাল গার্ডের স্বেচ্ছাসেবকরা রাতের বেলা এলাকা পাহারা দেয়- যাতে ইংরেজ সৈন্যরা কারো ঘরে ঢুকে লুটপাট আর কারো ইজ্জত সম্মান নষ্ট করতে না পারে। হাসান তখন তের বছরের এক স্কুল ছাত্র। তিনি এসময় স্বাধীনতার জন্য ডাকা হরতালে যোগ দেন আর রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা শোনেন। তখন দেশপ্রেম মূলক একটি গানের দুটি লাইন হাসানকেও নাড়া দেয়। সে দু'টি লাইন ছিল।

স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ - আল্লাহর ফেরেশতা ডাকছে মোদের
স্বাধীনতার ছায়াতলে জমা হতে না পারলেও জান্নাতুল ফিরদাউসে
দেখা হবে নিশ্চয়ই।

হাসান ইবাদত বন্দেগীতে ডুবে থাকলেও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ভোলেননি। হরতাল বিক্ষোভের সময় পুলিশের সাথেও তাদের সংঘর্ষ হত। হাসানের স্কুলের প্রিন্সিপাল হরতাল আর বিক্ষোভে ভয় পেতেন। তিনি হাসানকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যে মাহমুদ পাশা আব্দুর রাজ্জাকের কাছে নিয়ে গেলেন। প্রিন্সিপাল বললেন, হাসানই এই হরতালের জন্য দায়ী। সে ইচ্ছা করলে ছাত্রদের হরতাল থেকে বিরত রাখতে পারে। মাহমুদ পাশা হাসানকে অনেক ভাবে বোঝালেন। তিনি কখনো লোভ দেখালেন আবার কখনো হুমকি আর উপদেশের মাধ্যমে হরতাল করা থেকে হাসানকে বিরত থাকতে বললেন। বিষয়টি নিয়ে হাসানকে চিন্তা ভাবনা করার কথা বলে তিনি হাসানকে ছেড়ে দিলেন।

পুলিশ অফিসার মুগ্ধ হলেন

আরেক দিনের কথা। সেদিনও ছাত্ররা হরতাল করে। ছাত্রদের সংগ্রাম কমিটি হাসানের বাসায় এক সমাবেশের আয়োজন করে। পুলিশ কেমন করে যেন এই সমাবেশের কথা জানতে পারলো। সমাবেশ চলাকালে হঠাৎ পুলিশ বাসা ঘেরাও করে ফেলে । বাসার মালিক হাজন শয়ীরা পুলিশ দেখে বাইরে বের হন। পুলিশ তাকে সমবেত ছাত্র নেতাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করে। হাজন শয়ীরা পুলিশের অত্যাচারের ভয়ে মিথ্যা কথা বললেন। তিনি জানান, ছাত্র নেতারা খুব ভোর বেলা এখান থেকে বের হয়ে গেছে। আর ফিরে আসেনি। এই অসত্য কথা শুনে হাসান রেগে গেলেন। তিনি পুলিশ অফিসারের কাছে গিয়ে সত্য কথা বললেন। আর সাথে সাথে একথাও বললেন, আমরা আর আপনারা আলাদা কেউ নই। আমরা সকলেই মিসরীয়। স্বাধীনতা আমাদের অধিকার। আমাদের এই আন্দোলনে যোগ দেয়া আপনাদেরও কর্তব্য। আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ করার জন্য ধরপাকড় করা আপনাদের উচিৎ নয়।

পুলিশ অফিসার হাসানের কথা শুনে মুগ্ধ হলেন। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। হাসানের কথা এত তীব্রভাবে তার অন্তরে গেঁথে গেল যে তিনি ছাত্রনেতাদের আর ধরার চেষ্টা করলেন না। বরং তখনি সেখান থেকে পুলিশ বাহিনী নিয়ে ফিরে গেলেন।

আব্বার সাথে ঘড়ি মেরামত ও বই বাঁধাই

হাসান দামান হুরের স্কুলে পড়তেন। সেখানে শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত তাকে থাকতে হত। বৃহস্পতিবার স্কুল হাফ- ডে এজন্য তিনি স্কুল করে জোহরের সময় মাহমুদিয়ায় চলে আসতেন। মাহমুদিয়ায় তাঁর আব্বা,আম্মা, ভাই-বোন ও আরও সকলে থাকতেন। শুক্রবার রাতে শায়খ শালবীর রিজালের বাসায় সামষ্ঠিক পাঠ হত। এসময় এহইয়াউল উলুম, আহওয়ালুল আওলিয়া ও আল ইয়াকুত ওয়াল জাওয়াহের-এর মত মূল্যবান বই নিয়ে আলোচনা হত। হাসান এতে যোগ দিতেন। এর পর ভোর পর্যন্ত আল্লাহর জিকর হত। হাসান স্কুল ছুটির দিনে তাঁর আব্বার সাথে ঘড়ি মেরামত ও বই বাঁধাইয়ের কাজ করতেন। এ দু'টি কাজ তিনি ভালভাবে করতে পারতেন। রাতে হোছাফী এখওয়ানদের সঙ্গে আল্লাহর জিকর করতেন। হাসান সোমবার ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত নফল রোজা রাখতেন।

দারুল উলুমে ভর্তি

গ্রীষ্মের ছুটিতে হাসান সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ মুহাম্মদ খালফ্ নূহ এর বাসায় থাকতেন। এসময় তিনি আরবী ব্যাকরণের বই আলফিয়া মুখস্ত করা শুরু করেন। এ বইটির ব্যাখ্যা গ্রন্থ ইবনে আকীল এর পাঠও এসময় তিনি নিতে শুরু করেন। আর ফিকহ্ উসূল ও হাদীসের অনেক কিতাবও তিনি পড়তে থাকেন। এর ফলে তিনি দারুল উলূমে ভর্তি হওয়ার যোগ্য হন। দারুল উলূম মিশরের প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি রাজধানী কায়রোতে অবস্থিত। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মেধাবী ও ভাল ছাত্ররা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে আসে। এজন্যে তাদের ডাক্তারী পরীক্ষা এবং অন্যান্য পরীক্ষা দিতে হয়। হাসান দারুল উলূমে ভর্তি হতে চান। তাই তিনি কায়রো গেলেন। তখন তার বয়স ষোল বছর। আসরের সময় তিনি কায়রোর বাবুল হাদীদে নামলেন। সেখান থেকে ট্রামে উঠলেন। গন্তব্যস্থল আতবা থেকে টমটম যোগে সাইয়্যেদুনা হুসাইন -এ গেলেন। সেখানে তাঁর আব্বার এক বন্ধু থাকেন। ভদ্রলোক কিতাব বিক্রির ব্যবসা করেন। সাথে ছিল আব্বার দেয়া চিঠি। তার হাতে হাসান চিঠিটা দিলেন। তিনি চিঠি দেখলেন না। কেননা হাসানকে আগে থেকে চিনতেন। একজন কর্মচারীর ওপর হাসানের দেখাশুনার ভার দিলেন। কর্মচারীর সঙ্গে তিনি তাঁর বাসায় গেলেন। সেখানে ইফতার করেন। তার কাছ থেকে দারুল উলূম পৌঁছার পথ জেনে নিয়ে তিনি টমটমে চড়ে 'আতাবা' পৌঁছেন। সেখান থেকে ট্রামে করে কাছরুল আইনী সড়কে যান। সামনেই ছিল দারুল উলূমের ভবন। সেখান থেকে ছাত্ররা বের হচ্ছিল। হাসান তার বন্ধু ওস্তাদ মুহাম্মদ শরফ হাজ্জাজের জন্য অপেক্ষা করলেন। তিনি একবছর আগে দারুল উলূমে ভর্তি হন। কিছুক্ষণ পর বন্ধুর সাথে হাসানের দেখা হল। বন্ধু তাকে বারাকাতুল ফীল-এ নিয়ে যায়। সেখানেই ছিল আব্দুল বাকী মহল্লা। এই মহল্লার একটি বাসায় বন্ধু থাকতেন। হাসান সেখানেই উঠলেন। পরে তিনি ছাত্রদের পরামর্শে একজন মহিলা ডাক্তারের ক্লিনিকে যান। তিনি হাসানের চোখ পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফিস নেন ৫০ ক্রোশ। এরপর নাম্বার দিয়ে চশমার দোকানে পাঠান। দোকানদার হাসানের চশমা বানিয়ে দিল। এজন্য তাকে ১শ ৫০ ক্রোশ দিতে হল। মেডিকেল পরীক্ষায় হাসান সফল হলেন। এবার তিনি ভর্তি পরীক্ষার জন্য ভালভাবে প্রস্তুত হতে থাকেন।

আবার রাতের স্বপ্ন

যে দিন হাসানের পরীক্ষা তার আগের রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, কয়েকজন বড় বড় আলেমের সাথে তিনি একটা নৌকায় চড়েছেন। তাদের নৌকা নীল নদের উপর দিয়ে চলছে। তখন মৃদু মন্দ বাতাস বয়ে যাচ্ছে। আলেমদের একজন জিজ্ঞেস করলেন, আলফিয়্যার শরাহ্ ইবনে আকীল কোথায়? হাসান বললেন, এই তো। তিনি বললেন, এসো এর কোন কোন অধ্যায় আমরা আবার পড়ি। অমুক পৃষ্ঠা খোল। হাসান পৃষ্ঠাগুলো খুললেন এবং বিষয়গুলো আবার পড়লেন। এরি মধ্যে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। হাসানের মন ভীষন আনন্দে ভরে গেল। পরীক্ষার হলে যেসব প্রশ্ন পেলেন সেগুলো আগের রাতে স্বপ্নেই তিনি দেখে নিয়েছেন। তার পরীক্ষা ভাল হল। তিনি দরুল উলূমে ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হলেন। এদিকে কায়রো থেকে ফিরে তিনি টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার ফল বের হল। স্কুলে তিনি প্রথম হলেন। আর সারা দেশে পঞ্চম স্থান পেলেন। প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড হাসানকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগ দিল। তাকে গ্রীষ্মের ছুটির শেষে কর্মে যোগ দিতে বলা হল। এসময় তিনি পড়লেন মহা ফাঁপরে। একদিকে চাকুরী আর অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ। শেষ পর্যন্ত তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণকেই বেছে নিলেন। এজন্য তাকে কায়রো যেতে হবে। কেননা দারুল উলূম সেখানেই। আর শায়খ আব্দুল ওয়াহাব হোছাফীর ঠিকানাও কায়রোতে।

কায়রোতে হাসানের পরিবার

পরীক্ষা শেষে হাসান মাহমুদিয়ায় গেলেন। এর আগেই তাদের বাড়ীতে ঐ খবর পৌঁছে গেছে। পরীক্ষার ফল বের হল। হাসান প্রথম হলেন। তার মা চাপ দিলেন, হয় তাকে চাকুরী নিতে হবে না হয় মাকেও কায়রোতে নিয়ে আসতে হবে। হাসান উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকেই প্রাধান্য দিলেন। তাই মাকে কায়রোতে আনার জন্য বাসা ভাড়া নিলেন।

হাসানের ছোট দু'ভাই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে। আব্বার ইচ্ছা আল আজহারে ভর্তি করাবেন। মাহমুদিয়ায় শিক্ষার তেমন সুযোগ নেই। কাজেই তাদের গোটা পরিবারের জন্য কায়রো গমনই উত্তম।

হাসানের আব্বা কায়রো গেলেন। তিনি উপার্জনের চেষ্টা করে সফল হলেন। ফলে গোটা পরিবার কায়রো বদলী হয়ে যায়।

মাহমুদিয়ায় ঘড়ির দোকান

হাসান মাহমুদিয়ার কথা ভুলতে পারলেন না। কেননা সেখানে তাঁর প্রিয় বন্ধু আহমদ আফেন্দি সাকাফী রয়েছেন। তিনি ব্যবসায়ী। সেবার এক বছর কায়রোতে এসে তিনি ব্যবসা করেন। ফলে হাসানের সাথে তার দেখা সাক্ষাৎ আগের মতই হল। এরপর তিনি মাহমুদিয়ায় ফিরে যান। হাসানের সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে তার যোগাযোগ বজায় থাকে। গ্রীষ্মের ছুটি হাসান মাহমুদিয়ায় কাটাতে চাইলেন। এজন্যে আব্বাকে বললেন, তিনি মাহমুদিয়ায় গিয়ে একটি ঘড়ির দোকান দেবেন। এতে এ পেশায় তার বাস্তব অভিজ্ঞতা হবে। তবে হাসানের আব্বা ছেলের মাহমুদিয়ায় যাওয়ার আসল কারণ ভাল ভাবেই জানতেন। কিন্তু ছেলের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি অনুমতি দিলেন। হাসান মাহমুদিয়ায় একটি দোকান নিয়ে ঘড়ি মেরামত করার কাজ শুরু করেন। এর ফলে দু'ভাবে তিনি লাভবান হন। একটি হচ্ছে তিনি আত্মনির্ভর হওয়া শিখলেন, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে নিজ হাতে জীবিকা অর্জনের সৌভাগ্য। মাহমুদিয়ায় হাসান বন্ধু আহমদ আফেন্দির বাসায় থাকতেন। এর ফলে তারা দু'জনে হোছাফী ভাইদের সাথে জিকর করতেন ও নানান বিষয়ে আলোচনা করতেন। দিনে নীলনদে গিয়ে গোসল করতেন। আর রাতে জিক্‌র ও ইবাদতে পুরাপুরি মগ্ন থাকতেন। এসময় দরুদ ও ওজীফাও আদায় করতেন। কিন্তু তিনি অন্ধ ভক্ত আর অনুসারী ছিলেন না বরং স্বাধীন চিন্তা ভাবনাও করতেন।

কফি শপে দাওয়াত দেবার প্রস্তাব

কফি শপে মানুষকে আল্লাহের পথে ডাকার প্রস্তাব দিলে বন্ধুরা হাসানের কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তারা বললেন, এটা একটা অসম্ভব কথা। কফি শপে কে ধর্মের কথা শুনবে? সেখানে তো মানুষ অবসর কাটাতে আসে। কেউবা চিত্ত বিনোদনের জন্যে আসে। হাসান তাদের অনেক যুক্তি দেখালেন। তিনি বললেন, যারা মসজিদে যায় তাদের চেয়ে কফিশপে গমনকারী লোকরা বেশী উপদেশ আর নসিহত শুনতে ভালবাসে। তবে এজন্য ভালো আলোচ্য বিষয় বেছে নিতে হবে আর এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে তাদের আবেগ অনুভূতির উপর আঘাত না হানে। এছাড়া সুন্দর ভাবে তাদের কাছে দাওয়াত তুলে ধরতে হবে। তাছাড়া কম সময়ের মধ্যে কথা শেষ করতে হবে।

কফি শপে ইসলামের দাওয়াত

কফি শপে ওয়াজ আর তাবলীগের কাজ শুরু হল। হাসানই পরিকল্পনাকারী। আবার তিনিই এর বাস্তবায়নকারী। একদিন হাসান তার বন্ধুদের নিয়ে সালাহুদ্দিন পার্কের কফি শপে গেলেন। কফি শপের মধ্যে লোকে লোকে ঠাসা। কোন টেবিল খালি নেই। লোকজন কফি পান করছে আর আলাপ আলোচনা করছে। হাসান সেখানে গিয়ে একজনের হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এসময় সিগারেটটি যাতে কারো গায়ে না পড়ে সেজন্য লোকজন সতর্ক হয়ে এদিকে ওদিকে সরে গেল। এবার হাসান সকলের উদ্দ্যেশ্যে বললেন, ভাইসব লক্ষ্য করুন, দুনিয়ার এই সামান্য আগুন থেকে বাঁচার জন্যে আমরা সকলে কতইনা পেরেশান। আর মৃত্যুর পর আখিরাতের আগুন থেকে বাঁচার জন্যে আমাদের মধ্যে কোনই চিন্তা ফিকির নেই। অথচ আখিরাতের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৭০ গুন বেশী কষ্টদায়ক। হাসানের কথাগুলো যেন তার অন্তর থেকে বের হচেছ। এগুলো এতই আন্তরিক যে উপস্থিত লোজন মুগ্ধ হয়ে ইসলামের দাওয়াত শুনলো। হাসান সময় বেশী নেননি। দশ মিনিটের মধ্যে তাঁর দাওয়াত তুলে ধরে বিদায় নিতে চাইলেন। কিন্তু কফিশপের মালিক তাদের কফি পান করাতে চাইলেন। হাসান কিছুতেই রাজী নন। কেননা তাঁরাতো নবীদের কাজ করছেন। নবীরা ইসলামের দাওয়াত দিয়ে সেজন্য মানুষের কাছ থেকে কোন টাকা পয়সা বা অন্য কোন বিনিময় মূল্য চাইতেন না। শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্যেই তারা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন। কোরআন পাকের সূরা হুদের ১৫১নং আয়াতে আল্লাহ নবীদের দাওয়াত দেয়ার কথা বলছেন, 'লোকগণ, এ উপদেশ দানের জন্য আমরা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাইনা।'

হাসানও ঠিক সেভাবে কাজ শুরু করলেন। কফি শপের মালিক প্রথমে বিরক্তিবোধ করলেও তাদের সুন্দর সুন্দর কথাই খুব মুগ্ধ হন। তিনি আরো কথা বলার অনুরোধ জানান। কিন্তু হাসান রাজী হননি। তারা এক রাতেই সাইয়্যেদা আয়েশা মহল্লা থেকে শুরু করে তুলুন চক ও তরীকুল জাবাল হয়ে সালামা সড়ক ও সাইয়্যেদা জয়নবের অলি গলিতে ছড়িয়ে থাকা কফি শপে ওয়াজ করেন। সে রাতে হাসান ও তার বন্ধুরা ২০ টির বেশী কফি শপে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বক্তৃতা করেন। প্রতিটি বক্তৃতা ছিল পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময়ের জন্য। শ্রোতারা আগ্রহ সহকারে হাসানদের কথা শোনে। তারা এসব কথার পর কোন কিছু পান করা বা কোন উপহার না নেয়াতে তাদের কথা শ্রোতাদের অন্তরে ভাল

ক্রিয়া করে। হাসান তার পরিকল্পনায় একশ ভাগই সফল হলেন। দাওয়াত দেয়ার পর হাসান তার বন্ধুদের নিয়ে শায়খুন কেন্দ্রে ফিরে আসেন। তারা এভাবে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে চাইলেন। এজন্য আরো পদক্ষেপ নিলেন।

সাপ্তাহিক আল ফাতাহ্ প্রকাশ

মিসরে সে সময় ইসলাম বিরোধীতা বেড়ে চলছে। মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর জন্যে চেষ্টা চালানো হচেছ। এর ফলে মানুষ আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যাচেছ। হাসান এসব দেখে শুনে খুবই কষ্ট পেলেন। তিনি ইসলাম দরদী জ্ঞানী-গুনীদের কাছে তার মনের ব্যাথা প্রকাশ করেন। অনেক বড় বড় আলেমের কাছে গিয়ে তাদের একতাবদ্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু কেউ তার কথা শুনলো আবার কেউ শুনলোনা। শেষ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন আলেম ও বিখ্যাত ব্যক্তি একত্রে এক সভা করলেন। তারা ইসলামের দাওয়াতের কাজ করতে রাজী হলেন। সে সময় মিসরে কিবতী খৃষ্টানদের সংবাদপত্র খুব শক্তভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের খতমের লক্ষ্যে নানাভাবে চেষ্টা করতো। হাসান তাদের মোকাবেলায় আল ফাতাহ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন। পত্রিকার যাবতীয় কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় শায়খ আব্দুল বাকী সারওয়ার নাঈম এবং সাইয়্যেদ মুহিবুদ্দিন আল খতিবের উপর। পরে শুধুমাত্র মুহিবুদ্দিন আল খতীব একাই এ কাজের দায়িত্ব নেন এবং এটা একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাতে পরিনত হয়। শিক্ষিত যুব সমাজ এ পত্রিকা থেকে পথের দিশা লাভ করতো।

শেষ শিক্ষাবর্ষ

১৯২৭ সাল হাসানের শেষ শিক্ষাবর্ষ। শিক্ষা জীবন শেষে হাসান কি করবেন বা কোন পথে যাবেন সেটা নিয়ে তিনি অনেক চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। তিনি শিক্ষক হওয়ার কথা ভাবলেন। এর মাধ্যমে তিনি দিনের বেলা শিশুদের শিক্ষা দেবেন আর রাতে শিশুদের পিতা মাতাকে ইসলামের দিকে ডাকবেন। তাদের শেখাবেন সৌভাগ্য কিভাবে অর্জন করতে হয়। কিভাবে চললে আনন্দ আর সুখ পাওয়া যায়।

দারুল উলুমে হাসান তার শিক্ষা জীবনের শেষ বর্ষে বেশ ভালভাবে পড়া শুনা করতে থাকেন। তিনি ডিপ্লোমা পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিছুদিন পরেই তাকে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়তে হবে। এটা ভেবে তিনি মনে বেশ কষ্ট পেতেন। কেননা এখানে কয়েক বছর থেকে পড়া শুনা করায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার একটা ভালবাসা হয়ে গেছে। এসব কথা ভেবে

হাসান কখনো কখনো দারুল উলুমের মসজিদে আল মুনীরা ও দারুল উলুমের পাঠ কক্ষের এককোনে চিন্তিত মনে দাঁড়িয়ে থাকেন। আল্লাহর নবীর একটি কথা তার মনে ভাসতো এ সময়। এতে বলা হয়েছে।' তুমি যাকে ভালবাস- শেষ পর্যন্ত তোমাকে তা ছেড়ে যেতে হবে।'

সে বছরেরই জুলাই মাসে হাসান দারুল উলুম থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেন। মৌখিক পরীক্ষা দেয়ার জন্যে হাসানকে দু'জন শিক্ষকের এক কমিটির সামনে উপস্থিত হতে হয়। পদ্য ও গদ্যের বিশাল এক ভান্ডার হাসানের মুখস্ত ছিল। তিনি ১৮ হাজার কবিতা মুখস্ত করেন। তোরফা ইবনে লবীদের গোটা কাব্যগ্রন্থ তার মুখস্ত ছিল। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য হাসান কঠোর পরিশ্রম করেন। কিন্তু তাতে তার কোন দুঃখ নেই। তিনি তো পরীক্ষা পাশের জন্য পড়ালেখা করেন না, বরং জ্ঞান লাভের জন্যেই এই পরিশ্রম করেন।

পরীক্ষায় পাশ ও চাকুরী

সেকালে দারুল উলুম থেকে যারা কৃতিত্বের সাথে পাশ করতেন তাদের বৈদেশিক বৃত্তি দিয়ে বিদেশে শিক্ষা নিতে পাঠানো হত। হাসান যে বছর পাশ করেন সে বছর এ বৃত্তি দেয়া হয়নি। হাসান শেষ পরীক্ষায়ও প্রথম হয়েছেন। এ কারণে বৃত্তি দেওয়া হলে তিনিই প্রথম সুযোগ লাভ করতেন। বৃত্তি না দেয়ায় হাসানের সামনে এখন শুধুমাত্র চাকুরীর পথই খোলা। তিনি ভেবেছিলেন, তিনি হয়তো কায়রোতেই চাকুরী করতে পারবেন। কিন্তু এবছর পাশ করেছে বেশী ছাত্র। আর চাকুরী রয়েছে আটটি। কিন্তু কায়রোতে কোন পদ খালি নেই। এ কারণে হাসান কায়রোতে চাকুরী পেলেন না। তাকে দেয়া হয়েছে ইসমাঈলিয়ার চাকুরী। স্থানটি দক্ষিণ মিসরে অবস্থিত। ইসমাঈলিয়াতে চাকুরীর কথা জানতে পেরে হাসান মন ক্ষুন্ন হন। তিনি শিক্ষা দপ্তরে গিয়ে এ নিযুক্তির জন্যে আপত্তি জানান। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। উল্টো তাকে বলা হল, ইসমাঈলিয়া ভাল শহরগুলোর মধ্যে একটি। সেটি শান্ত শহর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা এ শহর খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্যে বিখ্যাত। হাসান নিরূপায় হয়ে বাসায় ফেরেন। আব্বার সাথে এ বিষয়ে আলাপ করেন। আব্বা তাকে আল্লাহর নাম নিয়ে কর্মস্থলে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। হাসান আব্বার কথামত সেখানে যাওয়ার জন্য তৈরী হন। তিনি সেখানে গিয়ে কিভাবে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবেন সে চিন্তাতেই বিভোর হলেন। তিনি আরো ভাবলেন, আহমদ আফেন্দি সাকারী মাহমুদিয়ায় এ মিশনের দায়িত্ব নেবেন। বন্ধু শায়খ হামেদ আসকারিয়া এবং শায়খ আব্দুল হামিদকে কায়রোর দায়িত্ব দেয়া হবে। শায়খ হামেদ

আসকারিয়া আল আজহারের উচচ ডিগ্রী নিয়ে যাকাকীকে ওয়ায়েজ নিযুক্ত হন। তিনি সেখানে দাওয়াতের কাজ করবেন। আর শায়খ আব্দুল হামিদ উচচতর ডিগ্রী নেয়ার পর চাষাবাদ শুরু করেন। একই সাথে তিনি দাওয়াতেরও কাজ করবেন।

ইসমাঈলিয়ায় রওনা

১৯২৭ সালের ১৯ শে সেপ্টেম্বর। ভোরে হাসান ট্রেনে উঠলেন। ইসমাঈলিয়া গিয়ে সেখানকার সরকারী স্কুলে শিক্ষকতার চার্জ বুঝে নেবেন। স্টেশনে তার কয়েকজন বন্ধু এসেছিলেন তাকে বিদায় জানাতে। এদের মধ্যে মুহাম্মদ আফেন্দি শারনূবীও ছিলেন। তিনিও ভাল লোক। তিনি বললেন, ভালো মানুষ যেখানেই থাকে সেখানেই ভালো প্রভাব ফেলে। আমরা আশা করি আমাদের বন্ধু হাসান ইসমাঈলিয়া শহরেও ভালো প্রভাব ফেলবে। এ কথাগুলো হাসানের মনে গেঁথে গেল।

গাড়ী ছেড়ে দিল। যোহরের সময় ইসমাঈলিয়ায় পৌঁছার কথা। গাড়ীর মধ্যে সাক্ষাৎ হল কয়েকজন শিক্ষক বন্ধুর সাথে। তারাও একই স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। হাসান তাদের সাথে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আলোচনা করলেন। ট্রেন ইসমাঈলিয়ায় থামলো। হাসান শহর পানে তাকালেন। সুন্দর শহর। তিনি প্রথমেই আল্লাহর কাছে কল্যাণ ও ভালোর জন্য দো'আ করলেন। হাসান একটা থাকার হোটেলে উঠলেন। তিনি সেখানে ম্যানেজারের কাছে তার ব্যাগটা রাখলেন। পরে স্কুলে গেলেন। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে দেখা করলেন। পুরাতন শিক্ষক ইবরাহীম বানহাবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তারা দু'জন একই রুমে থাকা শুরু করেন। রুমটি জনৈকা ইটালীয় মহিলার সম্পত্তি। তার নাম ম্যাডাম ববিনা। রুমটির জন্যতাকে ভাড়া দিতে হত।

নবাগত হাসান

শহরে হাসান নবাগত। তাই হঠাৎ করে তিনি কোন কিছু করতে চান না। আগে সেখানকার পরিবেশ আর পরিস্থিতি বুঝতে হবে। তারপর কাজের সিদ্ধান্ত নেবেন। এজন্য প্রথম প্রথম তিনি শুধু স্কুল, মসজিদ আর তার রুমেই সময় কাটান। অন্য কোথাও যাননা। কোন ধরনের কোন কাজও করেননা। তিনি দেখলেন, শহরে ইংরেজদের বেশ প্রভাব। এখানে আসার পর পুরা ৪০ দিন তিনি বাইরে কোথাও বের হননি। শুধুমাত্র শিক্ষকতা,এবাদত বন্দেগী আর বই পুস্তক পড়ে সময় কাটান।

হাসান মসজিদে গিয়ে শহরটির মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ লক্ষ্য করলেন। শহরটির পশ্চিম দিকে রয়েছে বৃটিশ শিবির আর পূর্বদিকে রয়েছে সুয়েজখাল কোম্পানীর কর্মচারীদের কলোনী। শহরটি যেন এ দু'য়ের মধ্যে আবদ্ধ। বেশীর ভাগ লোক এ দু'টি স্থানেই কাজ করে। ইউরোপীয় জীবন ধারার সাথে শহরবাসীর গভীর সংযোগ রয়েছে।

কিন্তু তারপরেও তাদের মধ্যে রয়েছে ইসলামী জজবা। শহরবাসী আলেমদের কথা শোনে ও মানে। কিন্তু আলেমদের মধ্যে কয়েকটি গ্রুপ রয়েছে। এ কারনে সেখানে মানুষের মধ্যে কোন ঐক্য ও সংহতি নেই। কিন্তু ঐক্য ছাড়া কোন ভাল কাজ করা যায় না।

আবারও কপিশপে দাওয়াত

হাসান মানুষের মধ্যে বিভেদ দেখতে চাননা। তিনি চান সকলে মিলেমিশে থাকুক। এ জন্য তিনি ভাবতে লাগলেন, কিভাবে বিভেদ দূর করা যায়। কেউ যদি এ সমাজে ইসলামের কথা বলতে দাঁড়ায় তবে সমস্ত দল চায় তাকে নিজেদের মনমত কথা বলাতে। সেটাতো সম্ভব নয়। ফলে সে হয়তো একটি দলের লোক রূপে চিত্রিত হবে। অন্যরা তাকে বর্জন করবে। আর তার কথায় কান দেবে না। হাসান চান সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে। কিন্তু এখানকার পরিবেশ তার অনুকূল নয়। হাসান সিদ্ধান্ত নিলেন সকল দল ও গ্রুপ থেকে দূরে থাকবেন আর মসজিদের ভেতর লোকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন না। এর চেয়ে কফি শপে যারা আসে তাদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করাটাই ভাল হবে। তিনি বড় বড় তিনটি কফি শপ বাছাই করলেন। এসব কফি শপে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়। প্রতিটি কফি শপে সপ্তাহে দু'টি ইসলামী বক্তৃতা দেয়ার কর্মসূচী নেয়া হলো। এ তিনটি স্থানে হাসান নিয়মিতভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। প্রথম প্রথম তো এ ধরণের ওয়াজে সকলেই অবাক হয়ে যেত। কিন্তু ধীরে ধীরে সকলে এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে আর বেশ আগ্রহ দেখাতে থাকে। হাসান তার ওয়াজের মধ্যে কাউকে আঘাত দিয়ে কোন কথা বলেননা। আল্লাহ ও পরকালের স্মরণ আর নেকী করার লাভ ও পাপ কাজে ক্ষতির দিকে নজর দিতে তিনি মানুষকে ডাকেন।

এ দাওয়াতের প্রভাব

শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে হাসানের দাওয়াত শুভ প্রভাব ফেললো। মানুষের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনাও শুরু হল। যেখানে এ ধরনের ওয়াজের কর্মসূচী থাকে মানুষ শোনার জন্যে সেখানে ছুটে যায়। আর অপেক্ষা করতে

থাকে কখন এই ওয়াজ হয় সে জন্য। যারা এই ওয়াজ নিয়মিত শোনে তারা জেগে ওঠে। তাদের কর্তব্য কি সেটা তারা জানতে চায়। কিভাবে চললে তারা আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচতে পারবে আর জান্নাত পাবে সেটা তারা হাসানকে জিজ্ঞেস করে। হাসান তাদের কথার জবাব দেন। কিন্তু সেসব জবাবই শেষ কথা নয়। তিনি শুধু মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করেন। কেননা মানুষ আগ্রহী হলে তবেইনা ইসলাম মেনে চলতে পারবে।

হাতে-কলমে অজু ও নামাজ শিক্ষা

আগ্রহী শ্রোতারা হাসানের কাছে আরো জানতে চান। কিন্তু কফিশপে তা' সম্ভব নয়। সেজন্য তিনি একটি স্থান ঠিক করেন। সেখানে নিয়ে তাদের ওজু করা শেখান, কিভাবে নামাজ পড়তে হবে তা দেখান। ওজুতে কি লাভ তা বর্ণনা করেন। ওজু সম্পর্কে এক হাদীসে বলা হয়, যে লোক ভালোভাবে ওজু করে, তার দেহ থেকে সকল পাপ দূর হয়ে যায়, এমন কি তার নখের নীচ থেকেও পাপ দূর হয়ে যায়।' নামাজ পড়লে কিলাভ হবে হাসান সে সম্পর্কে হাদিস বলেন। এরকম এক হাদিসে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ওজু করে এবং তা ভালোভাবে সম্পন্ন করে অতঃপর দু'রাকআত নামাজ আদায় করে এবং নিজের অন্তর আর চেহারা তাতে নিয়োজিত রাখে তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হয়ে যায়।'

হাজী মুস্তফার স্থান

হাসান সহজ সরলভাবে ইসলামের দাওয়াত মানুষকে দিতে লাগলেন। এর ফলে এসব ওয়াজের খবর অল্প দিনের মধ্যেই দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো। বিপুল সংখ্যক লোক এসব ওয়াজে যোগ দিতে শুরু করে। এর মধ্যে হাসান ওয়াজের জন্য আরেকটি স্থান পেলেন। স্থানটি দিলেন হাজী মুস্তফা। তিনি আল্লাহর ওয়াস্তে এ স্থানটি দিলেন। মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত সেখানে হাসান ওয়াজ করেন। এরপর কফি শপে ওয়াজ করতে যান।

ষড়যন্ত্রকারীদের হতাশা

একরাতে হাসান লক্ষ্য করেন আলেমদের মধ্যকার মতভেদ নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য একব্যক্তি চেষ্টা করছে। তিনি বুঝতে পারলেন, যারা মুসলমানদের ঐক্য চায়না এটা তাদের কারসাজি। তার মুখ থেকে বিরোধপূর্ণ জবাব পেলেই ইসলামের দাওয়াতের কাজে তারা বাধা দেবে। হাসান বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি কিছু লোকের অসৎ উদ্দেশ্য ধরে ফেললেন। তাই বললেন, দেখুন আমি আলেম নই। একজন সাধারন মানুষ। কোরআনের কিছু আয়াত ও হাদিস মুখস্থ আছে।

কিতাব পড়ে আমার কিছু জানা হয়েছে। আমি স্বেচছায় মানুষকে ইসলামের কথা শুনাই। আমার কথা ভাল লাগলে দয়া করে তা' শুনুন। আর যদি আরো কিছু জানতে চান তবে আলেম বা বিজ্ঞ জ্ঞানীদের কাছে যেতে পারেন। কোন সমস্যায় পড়লে তারাই তার সমাধান দেবেন। হাসান আরো বললেন আপনাদের সামনে যা বলছি এতটাই হচেছ আমার জ্ঞানের দৌড়।

হাসানের এসব কথা শুনে ষড়যন্ত্রকারীরা হতাশ হয়। তারা কোনভাবেই আর এ দাওয়াতের কাজে বাধা দিতে পারলনা।

চার শ্রেণীর কর্তৃত্ব

হাসান ইসমাঈলিয়ায় এসেছেন আজ কয়েক মাস হল। বছর ঘুরতে আরো কয়েক মাস বাকী। এ সময় তিনি ইসলামের দাওয়াতের কাজের সাথে সাথে ইসমাঈলিয়ার সমাজ সম্পর্কে ভাবতে থাকেন এবং সেখানকার মানুষ ও তাদের অবস্থা গভীরভাবে দেখতে থাকেন। এজন্য তিনি খুব ভালভাবে খোঁজ খবর নিতে থাকেন। খোঁজ নিয়ে দেখলেন সেখানে চারটি শ্রেণী কর্তৃত্ব করছে। প্রথমেই রয়েছেন আলেম সমাজ, দ্বিতীয় হচেছন পীর সাহেবগণ,তৃতীয় হচেছন শহরের গণ্যমান্য লোকজন আর চতুর্থ হচেছ ক্লাব।

আলেমদের প্রতি হাসান

হাসান আলেমদের প্রতি আন্তরিকভাবেই সম্মান দেখান। তিনি কফি শপেই হোক বা অন্য যে কোন স্থানেই হোক যখনই ইসলামী দাওয়াতের কথা বলেন তখন কোন মাওলানা সাহেব এলে তাকে তাজিম ও আদবের সাথে সামনে আনেন। এজন্যে দরকার হলে কিছুক্ষণ আলোচনা বন্ধও রাখেন। আলেমদের প্রতি এভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখানোর ফল শুভ হয়। তাঁরাও হাসানের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেন। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে আলেমরা হাসানের পক্ষেই কথা বলতে থাকেন। এসময় একজন আলেম হাসানের দাওয়াতের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। তিনি আল আজহারের একজন পুরান আলেম। কেউ ওয়াজ করতে থাকলে তিনি নানান খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন করে তাকে নাজেহাল করে আনন্দ পেতেন। একবার হাসান ইসলামী দাওয়াত নিয়ে আলোচনা করছেন। কথা প্রসঙ্গে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর কাহিনী বর্ণনা করছেন। এমন সময় ঐ আলেম হযরত ইব্রাহীমের পিতার নাম জানতে চাইলেন। হাসান বললেন, কেতাবে তার নাম তারেখ বলা হয়েছে। আলেম বললেন, না শব্দটা তারুখ হবে। হাসান বিরোধে না গিয়ে তারুখ শব্দটিই মেনে নিলেন। এই নামের উচচারণের ব্যাপারে হাসান বরলেন যেহেতু নামটি আরবী শব্দ নয় কাজেই এর

সঠিক উচচারণ সেই ভাষার উপর নির্ভর করে। এসব জিনিসগুলো আসল নয়, উপদেশ গ্রহণ করাটাই হচেছ এসব কিস্‌সা কাহিনী বলার উদ্দেশ্য। এদিকে এসব তর্কবিতর্কে শ্রোতারা বিরক্ত হয়ে চলে যেতে থাকে। মাওলানা সাহেব এটাই চান। কিন্তু এভাবে লোকজন চলে গেলে হাসান কিভাবে দাওয়াতের কাজ করবেন? তাই তিনি বিষয়টি নিয়ে বেশ চিন্তা ভাবনা করলেন। শেষে এক উপায় বের করলেন।

একদিন তিনি ঐ মাওলানা সাহেবকে বাসায় দাওয়াত করলেন। মাওলানা সাহেব এলেন। হাসান তার প্রতি বেশ ভক্তি শ্রদ্ধা দেখালেন। তিনি ফিক্‌হ এবং তাসাউফ বিষয়ের দু'টি মূল্যবান কিতাব মাওলানা সাহেবকে উপহার দিলেন। মাওলানা সাহেব এতে বেশ খুশী হলেন। এতে ভাল ফলই ফললো। এরপর থেকে মাওলানা সাহেব হাসানের দাওয়াতের কাজে কোন বিঘ্ন ঘটাতেন না। বরং তিনি নিজেও হাসানের ওয়াজ শুনতেন। আর অন্যদেরও তা' শোনার দাওয়াত দিতেন। এ ঘটনা থেকে হাসান মহানবী (সঃ) এর একটি কথার সত্যতা বুঝতে পারলেন। মহানবী (সঃ) বলেন, তোমরা একে অন্যকে উপহার দেবে। এর ফলে উভয়ের মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

ঐক্য নিয়ে ভাবনা

ইসমাঈলিয়া শহরের মানুষ সরল মনা। এখানে আলেমদের কথা যেমন মানুষ শোনে তেমনি পীর মাশায়েখদের প্রতি তারা ভক্তি শ্রদ্ধা দেখায়। মিসরের বিভিন্ন স্থান থেকে পীর সাহেবরা এই শহরে আসেন। তারা ওয়াজ করেন এবং শেষে জিকরের মাহফিল করেন। হাসান এসব পীর সাহেবের মজলিসে যান তাদের কথা শোনার জন্যে। তিনি তাদের কাছে মুসলমান সমাজের অবস্থা বর্ণনা করেন। পৃথিবীর সেরা জাতি মুসলমান কেন আজ এত নীচে রয়েছে সে সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি দুঃখ করে বলেন, আফসোস- মিসরের রাজা ইংরেজদের কথায় উঠাবসা করেন। ইংরেজরা কিভাবে মিসরের মুসলমানদের ঠকাচেছ সেটাও বর্ণনা করেন। মুসলমানদের মধ্যে যাতে ঐক্য সৃষ্টি না হয় সেজন্য কাফের মুশরিকরা চেষ্টা চালাচেছ। তারা মুসলমানদের ছোট খাট বিষয় নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি আর বিবাদ করতে উস্কানি দেয়- যাতে মুসলমানরা এক হতে না পারে। অথচ আল্লাহ চান যেন মুসলমানরা এক হয়ে আল্লাহর রশিকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে। হাসান দরদ ভরা মন নিয়ে এসব কথা আলোচনা করেন। ইসমাঈলিয়ার পশ্চিম দিকে বৃটিশ সৈন্যদের শিবির আর পূর্বদিকে

সুয়েজ খাল কোম্পানীর অফিসই হাসানের এসব কথার বাস্তব প্রমাণ। হাসান বলেন, ইংরেজরা মিসরের সম্পদের ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা এদেশে এসে বড় বড় দালানে আরাম আয়েশে থাকে। আর মিসরের মানুষ তাদের নিজেদের দেশে বস্তিতে বাস করে। বস্তির ঘর এতই ছোট যে মানুষ সেখানে কষ্ট করে বেঁচে থাকে। একদিকে আরাম আয়েশ আর অপর দিকে দুঃখ-কষ্ট। সুয়েজ খাল কোম্পানী বিদেশী খৃষ্টান আর ইহুদীদের পরিচালনায় চলে। এই কোম্পানীর অফিস জাঁকজমকপূর্ণ। এখানে মিসরীয়রা চাকুরীর সন্ধানে আসে। তাদের সাথে চাকরের মত ব্যবহার করা হয়। অথচ বিদেশী খৃষ্টান আর ইহুদীরা এখানে বেশ সম্মান পায়। তারাই যেন এদেশের শাসক। কোম্পানী ইসমাঈলিয়া শহরের সব কিছুর হর্তা-কর্তা। আলো, পানি, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি পৌরসভার সব কাজ কোম্পানী নিজ হাতে নিয়ে রেখেছে। যাতায়াতের সব রাস্তা ঘাটও তাদের হাতে। কোম্পানীর অনুমতি ছাড়া কেউ এই শহরে ঢুকতে পারেনা। আবার কোম্পানীর ছাড়পত্র ছাড়া কেউ এই শহর ছাড়তেও পারেনা। বড় বড় সড়কের নাম ফলকও বিদেশী ভাষায় লেখা। এসব দেখে হাসানের মন দুঃখে ভরে যায়। তিনি অনেক সময় ইসমাঈলিয়ার গহীন বনে যান। ছবির মত সাজানো সেই বনে ঘুরে বেড়ান। আবার কখনো সুন্দর ঝিলের পারে নিজের দেশের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখেন তখন তার দুঃখ শত গুনে বেড়ে যায়। মিসর বাসীর অনৈক্য আর নিজেদের কারণেই যে এই সম্পদে ভরপুর দেশটি খৃষ্টান ও ইহুদীদের লুটপাটের কেন্দ্র হয়ে পড়েছে তা বুঝতে তার কষ্ট হয়না।

হাসান চান মুসলমানদের এক করতে, তাদের বিভেদ দূর করতে, এজন্যে যা করা দরকার তার সব কিছুই তিনি করছেন। হাসান লক্ষ্য করলেন শহরে সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দু'টি শিবিরে বিভক্ত। এর পেছেনে ধর্মীয় খুটিনাটি বিষয় নিয়ে বিরোধই প্রধান কারণ। শহরের বাইরে থেকে কোন শ্রমিক এখানে এলে এই দুটি শিবিরের যে কোন একটির সাথে যোগাযোগ রাখে। কিন্তু হাসান ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি মুসলমানদের বিভক্ত দেখতে চাননা। তাই উভয় শিবিরের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি যখন এক শিবিরে যান তখন অপর শিবির সম্পর্কে ভাল কথা বলেন। তাদের ভাল গুনের কথা এদের শোনান। তিনি কখনোই অপরের দোষের কথা আলোচনা করেননা। এর ফলে উভয় শিবিরের লোকজনই তাকে ভালবাসে আর ভাল জানে।

লেবার ক্লাবে গমন

ইসমাঈলিয়া শহরে শ্রমিকদের একটি ক্লাব রয়েছে, এটি লেবার ক্লাব নামে পরিচিত। ক্লাবে শিক্ষিত যুবকদেরও একটি দল আছে। তারা ভাল কথা শুনতে আপত্তি করেনা। নেশা প্রতিরোধ সমিতির একটি শাখাও এই ক্লাবে আছে। সমিতি মাদক দ্রব্য সেবনের কুফল নিয়ে আলোচনা করে। হাসান ক্লাবে যেতে শুরু করেন। তিনি সেখানে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আলোচনা করেন। এতে অনেকেই মুসলমান হিসাবে কি কি কাজ করতে হবে সে ব্যাপারে জানতে আগ্রহী হয়।

কায়রোর মুসলিম যুব সমিতি

হাসান কায়রোর সাথেও যোগাযোগ বজায় রাখছেন। তিনি আল ফাতাহ পত্রিকার দাওয়াত চালাতে থাকেন। এর ফলে শহরের বহু লোক এই পত্রিকার গ্রাহক হন। এই পত্রিকা ইসলামী আন্দোলনের পথে মানুষকে আহ্বান জানাতে থাকে। হাসান কায়রোর মুসলিম যুব সমিতির সাথেও যোগাযোগ করেন। তিনি এই সমিতিতে নিয়মিত চাঁদা দেন এবং এর সভাপতি আব্দুল হামিদ বেক সাঈদকে পত্র লিখে জানান যে তিনি সমিতির সাথে রয়েছেন।

তিনটি ধর্মের প্রতিনিধিত্ব

হাসান ইসমাঈলিয়ায় প্রথম যখন আসেন তখন হোটেলে ওঠেন। কিন্তু বেশীদিন হোটেলে থাকতে তার ভাল লাগেনা। তাই তিনি কোন বাসা ভাড়া নিতে চাইলেন। স্থানীয় লোকজনদের একথা জানাতেই তারা একটা ঘরের সন্ধান দিলেন। বাসাটি কয়েক তলা বিশিষ্ট। হাসান এবং তার সহকর্মী শিক্ষক বন্ধু উপরের তলায় ভাড়া নিলেন। বাসার দোতলার সবটা ভাড়া নেয় মিসরীয় খৃস্টানদের একটি গ্রুপ। সেখানে তারা একটা ক্লাব ও একটা গীর্জা স্থাপন করে। আর গোটা নীচের তলা ভাড়া নেয় একদল ইহুদী। তারাও সেখানে কিছু অংশ ক্লাব তার কিছু অংশ তাদের ধর্মমন্দির বানায়। হাসান আর তার বন্ধু তিন তলায় ভাড়া নিয়েছেন। সেখানে তারা নামাজ পড়েন আর মসজিদের জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করেন। এর ফলে গোটা বিল্ডিংটা যেন তিনটি ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে।

ইখয়ানুল মুসলিমুন গঠন

১৯২৮ সালের মার্চ মাস। ইসমাঈলিয়ায় হাসানের আগমনের একবছর হয়ে গেছে। সে সময় ৬ জন বন্ধু এলেন তার বাসায়। এরা হচেছন,হাফেজ

আব্দুল হামিদ, আহমদ আল হাছরি, ফুয়াদ ইবরাহীম আব্দুর রহমান হাসবুল্লাহ, ইসমাঈল ইজ্জ এবং যাকী আল মাগরেবি। তারা হাসানের দাওয়াতে মুগ্ধ। কিছু একটা করতে চান। কিন্তু কিভাবে কি করবেন তা'ভেবে পাচেছন না। সেজন্যই তারা হাসানের পরামর্শ নিতে তার কাছে এসেছেন। তারা বললেন, হাসানের ওয়াজ শুনে তারা দেশের অবস্থা বুঝতে পারছেন। মুসলমান সেরা জাতি হয়েও আজ খৃষ্টান আর ইহুদীদের পায়ের নীচে পড়ে মার খাচেছ। এর কারণ তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের পথ ছেড়ে দিয়েছে। আবার যদি আল্লাহর পথে ফিরে আসে তবে তারা আবারো সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পাবে। তাই তারা আল্লাহর পথে চলার জন্যে একটা দল করতে চায়। আর হাসান যেন তার সব ব্যবস্থা করে দেন। হাসান বুঝতে পারলেন, এতদিন ধরে তিনি যে ইসলামের পথে মানুষকে ডেকে যাচেছন আজ তার সুফল ফলতে শুরু করেছে। তার ডাকে মানুষ আজ ইসলামের রশিকে মজবুত করে ধরতে আগ্রহী। এ অবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কাজেই হাসান বললেন, আল্লাহ আপনাদের চেষ্টাকে কবুল করুন। আমাদের কর্তব্য, চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। সফলতা আল্লাহর হাতে। তিনি তাদেরকে নিয়ে আল্লাহর কাছে ওয়াদা করলেন, আজ থেকে আমরা হব ইসলামের দাওয়াতের সৈনিক। কেননা দেশ ও জাতির মঙ্গল ইসলামের দাওয়াতের মধ্যেই রয়েছে।

এরপর তারা শপথ করলেন, তারা ভাই ভাই হয়ে জীবন কাটাবেন। ইসলামের জন্য কাজ করবেন। আর ইসলামের পথে জিহাদ হবে তাদের ব্রত। একজন বললেন, আমরা কি নামে নিজেদের ডাকবো। হাসান বললেন,ইসলামের খেদমতের জন্যে আমরা পরস্পর ভাই ভাই। একারণে আমাদের নাম হবে আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন। বাংলায় মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ। সকলের মুখে মুখে এ নাম উচচারিত হল। হাসান তার এই ৬জন বন্ধুকে নিয়ে গঠন করলেন ইখাওয়ানুল মুসলিমুন। যাত্রা শুরু হলো নতুন এ সংগঠনের। মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে আল্লাহর পথে পরিচালিত করাই হবে এই দলের কাজ।

এক বছরে ইখওয়ান

হাসান ইখওয়ানের সদস্যদের একত্রিত হবার জন্য একটি রুম ভাড়া নিলেন। শাহ ফারুক সড়কে শায়খ আলী শরীফের কাছ থেকে মাসিক ৬০ ক্রোশ দেবার চুক্তিতে এই রুমটি ভাড়া নেয়া হয়। এখানে সদস্যদের শুদ্ধ ভাবে কোরআন শেখানো শুরু হয়। ইসলামের বিভিন্ন বিধান, রাসুল (সাঃ)এর জীবনী এবং সাহাবা ও অলী আল্লাহদের জীবন ধারাও এখানে আলোচনা করা হয়।

যোগ্য লোকদের দাওয়াতে তাবলীগের কাজ করার ট্রেনিং দেওয়া হতে থাকে। এভাবে দেখা গেল ১৯২৭-২৮ সালের শিক্ষাবর্ষ শেষে ইখওয়ানের প্রথম গ্রুপের সংখ্যা ৭০ এ পৌঁছেছে।

ইখওয়ান সদস্য হাফিজ

ইখওয়ানের সদস্যরা আল্লাহ ও তার রাসুল (সঃ) কে ভালবাসেন। তারা কোরআন ও হাদিস মেনে চলেন। এর ফলে তারা সমাজের আর পাঁচজনের তুলনায় খুবই ভাল হয়ে গেলেন। কাজেই তাদের চরিত্র দেখে শুধু অন্য মুসলমানই নয় বরং অন্য ধর্মের লোকেরাও মুগ্ধ হয়ে গেল। এরকম ইখওয়ানের এক সদস্যের নাম হাফিজ। তিনি যন্ত্রপাতি সারাবার কাজ জানেন। একজন অভিজ্ঞ টেকনেশিয়ান। কিন্তু সত্যিকার মুসলমান। তিনি আল্লাহকে ভয় করেন। কোন মানুষকে ঠকাননা। যে কাজের যে মূল্য তার চেয়ে কম দাম নেন। মানুষের প্রতি তার অগাধ ভালবাসা। একবারের এক ঘটনা খুবই মজার।

সুয়েজ খাল কোম্পানীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার একজন বিদেশী খৃষ্টান। তার দেশ ফ্রান্স। তিনি একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ার। নাম মিঃ সভল্যান্ট। দক্ষ হওয়ায় তিনি এ চাকুরী পেয়েছেন। তার বাসায় ছিল কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি। একবার কোন কারণে সেগুলো অচল হয়ে গেল। সেগুলো সারাবার জন্যে একজন ভাল টেকনিশিয়ান দরকার। তিনি স্থানীয় লোকদের কাছে খোঁজ করলেন। লোকেরা হাফিজের কথা জানালো। তিনি হাফিজকে ডেকে যন্ত্রপাতি দেখালেন। জিজ্ঞেস করলেন,

-আপনি এই কাজ করতে পারবেন?

-জ্বী করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

-কত নেবেন?

-১৩০ ক্রোশ দিতে হবে।

-আপনি কি লুটেরা?

-কেন?

-আপনি বেশী মজুরী চাচেছন।

-না, মোটেই নয়। আমি ন্যায্য মজুরীর চেয়েও কম চাচিছ।

-আমারতো মনে হয় আপনি বেশী চাচেছন।

-আচছা এক কাজ করুন একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকুন- তিনি বলবেন এ কাজের মজুরী কত হতে পারে। আমি বেশী চাইলে শাস্তি হিসেবে আমি বিনা মজুরীতে আপনার কাজ করে দেব।

-ঠিক আছে তাই হবে।

মিঃ সভল্যান্ট তার কোম্পানীরই আরেকজন ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে পাঠালেন। তাকে যন্ত্রপাতি দেখালেন। সেগুলোকে সারাবার মজুরী কত হতে পারে জিজ্ঞেস করলেন। ইঞ্জিনিয়ার বললেন, এর ন্যায্য মজুরী ২০০ ক্রোশ।

একথা শুনে মিঃসভল্যান্টের টনক নড়ল। তিনি এবার আর কোন কথা না বাড়িয়ে কাজ শুরু করতে বললেন। কিন্তু হাফিজ বললেন,

-আপনি আমাকে অপমান করেছেন। সে জন্য মাফ চাইতে হবে। আর আপনার বাজে মন্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। তবেই আমি কাজ করতে পারি।

- তোমার কাছে আমাকে মাফ চাইতে বলছো? কে তুমি? যদি তোমাদের রাজা ফুয়াদও আসে আমি মাফ চাইবোনা।

- মিঃ সভল্যান্ট এখন আপনি আরেকটি ভুল করলেন। আপনি রাজা ফুয়াদের দেশে আছেন। আপনি আমাদের দেশে মেহমান। কাজেই এ কথা বলা ঠিক নয়। আর রাজা ফুয়াদের প্রতি অসম্মানজনক কথা বলার সুযোগ আমি আপনাকে দেবনা।

- আমি আপনার কাছে মাফ না চাইলে আপনি আমার কি করবেন?

- আমি আপনাদের দূতাবাসে আর রাষ্ট্রদূতকে একথা জানাবো। এরপর প্যারিসে সুয়েজ কোম্পানীর বড় বড় কর্মকর্তাকে জানাবো। পরে ফ্রান্সের পত্র পত্রিকা সহ বিদেশের পত্র পত্রিকায় এ বিষয়ে চিঠিপত্র লিখবো। এখানে প্রশাসনিক কাউন্সিলের যে সদস্যই আসবেন তাকেও জানানো হবে।

- মনে হচেছ কোন টেকনেশিয়ান নয় বরং আমি আমার চেয়ে বড় কোন কর্মকর্তার সাথে কথা বলছি। আপনি জানেন না আমি প্রধান ইঞ্জিনিয়ার? আমি আপনার কাছে মাফ চাইবো- এটা কি হতে পারে?

- সুয়েজ কোম্পানী আমাদের দেশে রয়েছে। আপনাদের দেশে নয়। এই কোম্পানীর ওপর আপনাদের অধিকার কিছুদিনের জন্য। শেষ পর্যন্ত আমরাই এর মালিক হব। তখন আপনি আর আপনার মত অনেকেই হবে আমাদের কর্মচারী। কাজেই আমি আমার অধিকার ছেড়ে দেব এটা কেমন করে আপনি ভাবতে পারলেন?

- আমি আপনার কাছে মাফ চাচিছ। আমার কথা প্রত্যাহার করছি।

- ধন্যবাদ। আমি কাজ শুরু করছি।

হাফিজ কাজ শুরু করে অল্পক্ষনের মধ্যেই শেষ করলেন। কাজ শেষ হলে মিঃ সভল্যান্ট হাফিজকে ১৫০ ক্রোশ দিলেন। হাফিজ ১৩০ ক্রোশ নিয়ে বাকী ২০ ক্রোশ ফিরিয়ে দিলেন। সভল্যান্ট বললেন,

- আপনি এই ২০ ক্রোশও নিন। এটা বখশিস দিলাম।

- না না তা'হয় না। অধিকারের চেয়ে বেশী নিয়ে আমি লুটেরা হতে চাইনা।

- আমার অবাক লাগছে- সবাই কেন আপনার মত হয় না? আচছা আপনি কি হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর পরিবারের লোক?

- মিঃ সভল্যান্ট জেনে রাখুন- সব মুসলমানই হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর পরিবারের লোক। তবে তাদের মধ্যে কিছু লোক ইহুদী খৃষ্টান সাহেবদের অনুকরন করতে শুরু করেছে। এ কারনে তাদের স্বভাব নষ্ট হয়ে যাচেছ।

মিঃ সভল্যান্ট আর কথা বলেননি। তিনি হাফিজের সাথে হাত মেলালেন। তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় করলেন।

ইখওয়ান সদস্য হাসান মারসি

ইখওয়ানের আরেক সদস্য হাসান মারসি। তিনি রেডিও বাক্সের উন্নত মানের নমুনা তৈরী করতে পারেন। এক জায়গায় তিনি কাজ করেন। সেকালে রেডিও বাক্স তৈরীতে প্রায় এক পাউন্ড ব্যয় হত। হাসান মারসির মালিকের নাম মানিও। মানিওর একজন বন্ধু এসে গোপনে প্রস্তাব দিল যে হাসান মারসি তার জন্যে কয়েকটা বাক্স তৈরী করে দেবেন অর্ধেক দামে। শর্ত হচেছ মানিওকে এ সম্পর্কে কিছু বলা যাবেনা। এভাবে প্রতিটি বাক্সে হাসান মারসি পাবেন অর্ধেক পাউন্ড আর মানিওর বন্ধুর লাভ হবে বাকী অর্ধেক পাউন্ড। অর্ধেক দামে সে বাক্স পেয়ে যাবে। হাসান মারসির উপর মানিওর অগাধ বিশ্বাস। এ কারণে ওয়ার্কশপের সব কাঁচামাল আর যন্ত্রপাতি সে হাসান মারসির হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। মানিওর বন্ধু এই আস্থার অবৈধ সুবিধা নিতে চেয়েছিল। কিন্তু হাসান মারসি তা হতে দেননি। তিনি বললেন, সব ধর্মেই অসাধুতাকে হারাম মনে করে। আমার প্রতি যার এত বড় বিশ্বাস আর আস্থা রয়েছে- তার সাথে খেয়ানত করা অসম্ভব। অথচ তার বন্ধু এবং তার ধর্মের লোক হয়ে আপনি তাই করতে চাচেছন। আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত।

- আমি মানিওকে বলবো, আপনার কারিগর আমাকে এই প্রস্তাব দিয়েছে। সে আমার কথা বিশ্বাস করবে। ফলে তোমাকে কানে ধরে বের করে দেবে। কাজেই তুমি আমার কথা মত কাজ কর। এটা ভাল হবে।

- তোমরা যা খুশী কর। ইনশাআল্লাহ তুমিই অপদস্থ হবে।

লোকটি মানিওর কাছে গিয়ে মিথ্যা কথা বললো। মানিও ব্যাপারটা সম্পর্কে খোঁজ নিলেন। তখন সব কিছু বুঝতে পারলেন। হাসান মারসির কথাই তিনি বিশ্বাস করলেন। ফলে তার ধোঁকাবাজ বন্ধুকেই তিনি ঘর থেকে বের করে দিলেন। আর আমানতদারীর জন্য হাসান মারসির বেতন বাড়িয়ে দিলেন।

ইখওয়ানের সদস্যরা এরকমই ছিলেন। তারা ভাল মানুষ ছিলেন। তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত। তারা যেমন ভাল মানুষ ছিলেন তেমনি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন। আর সব কাজই করতেন আল্লাহরকে খুশী করার জন্য।

মসজিদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত

হাসান ঠিক করলেন, ইসমাঈলিয়ার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ছড়াবেন। তাদের মধ্যে কাজ করবেন। তিনি নিজে একজন সহকারী শিক্ষক। তাকে বদলি হতে হবে। আর যারা দাওয়াতের কাজ করেছেন তারাও সরকারী কর্মচারী। এ জন্য স্থায়ী বাসিন্দাদের আকৃষ্ট করতে হবে। তাদের দাওয়াতের কাজে লাগাতে হবে। এ জন্য শহরে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই মসজিদের সাথেই দলের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ইসমাঈলিয়ায় একটি মসজিদ স্থাপনের জন্য হাসান ইখওয়ানের সদস্যদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। ঠিক হল, প্রথমে তারা নিজেরাই এজন্য দান করবেন। এরপর অন্যদের কাছে দান সংগ্রহ করবেন। সে অনুযায়ী তারা নির্ধারিত সময়ে ৫০ পাউন্ড সংগ্রহ করে আফেন্দি আবু সউদের কাছে জমা করেন। আল্লাহর জন্য দান করলে সে দানই আল্লাহর কাছে কবুল হয়। এজন্য সদস্যরা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই দান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা দান করতে থাকলেন। এ দান করার জন্য তাদের কষ্ট স্বীকারের কথা কাউকে তারা বললেন না। কিন্তু মানুষ লুকাতে চাইলেও আল্লাহ তার বান্দাদের শেখানোর জন্য ভাল মানুষদের ত্যাগ স্বীকারের কথা অনেক সময় প্রকাশ করে দেন। এ রকমই এক ঘটনা ঘটলো।

মসজিদের জন্য ইখওয়ান সদস্যের সাইকেল বিক্রি

একজন সদস্যের নাম আস্তি আলী আবুল আ'লা। কয়েকদিন ধরে হাসান লক্ষ্য করেন, তিনি নির্ধারিত সময়ে আলোচনায় আসতে পারেন না। হাসান কারন জিজ্ঞেস করলেন। তিনি নানান ওজর দেখালেন। কিন্তু হাসানের কাছে সেসব কারন সঠিক বলে মনে হল না। তিনি খবর নিয়ে জানতে পারলেন, ঐ

সদস্য মসজিদ তৈরীর তহবিলে দেড়শ' ক্রোশ দান করার ওয়াদা করেন। অথচ তার আয় খুবই কম। তারপক্ষে তা'দেয়া সম্ভব নয়। এজন্য তিনি বাধ্য হয়ে তাঁর সাইকেল বিক্রি করেন। সাইকেল না থাকায় তাঁকে অফিস থেকে বাসে আসতে হয়। শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে বাস থেকে নেমে তিনি হেঁটে আসেন। সাইকেল বেঁচে তিনি যা পেয়েছিলেন সেটাও তিনি দান করেন। এসব কথা জানতে পেরে অন্যান্য ইখওয়ানরা নিজেরা চাঁদা তুলে সেই সদস্যের জন্য একটি নতুন সাইকেল কিনে উপহার হিসেবে তাঁকে দিলেন। এটা ছিল তাঁর আন্তরিক ভাবে দান করার জন্য দুনিয়ার পুরস্কার। আর আখেরাতে আল্লাহপাক আন্তরিক দানের জন্য অনেক বড় পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষনা করেছেন।

মসজিদের জন্য ওয়াকফ্ জমি

হাসান মসজিদের জন্য জমি খুঁজতে থাকেন। সাধারণ মানুষের কাছে মসজিদ তৈরীর কথা বলা হল। তারা খবর দিলেন হাজী আব্দুল করিমের কাছে একটা জমি আছে। তিনিও সেখানে মসজিদ তৈরীর কথা ভাবছেন। হাসান তার সাথে দেখা করলেন। তিনি মসজিদ তৈরীর কথা জেনে খুশী হলেন। ইখওয়ানেরা এ ব্যাপারে তার সাথে চুক্তি করেন। তিনি মসজিদের জন্য জমিটা ওয়াক্ফ করে দিলেন।

খারাপ লোকদের বাঁধা

কেউ ভাল কাজ করতে গেলে নানান দিক থেকে তাকে বাধা দেয়া হয়। ভাল লোকেরা আল্লাহকে ভয় পান। তারা ভাল কাজ করতে গিয়ে আল্লাহর সাহায্য লাভ করেন। এজন্য তারা খারাপ লোকের বাধা দানে ভয় পাননা। বাধার মধ্য দিয়েও তারা ভাল কাজ করতেই থাকেন। ধৈর্য্য ধরে ভাল কাজ করতে থাকলে মানুষ সফলতা লাভ করে।

হাসান মসজিদ করবেন। এটা জানতে পেরে খারাপ লোকেরা ক্ষেপে উঠলো। মসজিদ যাতে না হয় সেজন্য হাসান এবং ইখওয়ানদের সম্পর্কে নানান খারাপ কথা বলতে লাগলো। তারা বললো, এসব লোক অপদার্থ। কোন ভাল কাজ এদের দ্বারা হবেনা। এরা শুধু পরের জিনিষ নিতে চায়। খারাপ লোকেরা জমিদাতা আব্দুল করিমের কাছে গিয়েও হাসানদের সম্পর্কে নানান কথা লাগালো। আব্দুল করিম ছিলেন সহজ সরল লোক। তাদের কথা তিনি বিশ্বাস করলেন। হাসান দেখলেন এসব জিনিষ নিয়ে খামাখাই হাঙ্গামা আর গন্ডোগোল হবে। এজন্য তিনি আব্দুল করিমের সাথে দেখা করে তার জমি ফিরিয়ে দিলেন। হাসান ভাবলেন, এভাবে নয়-বরং তারা জমি কিনে সেখানে মসজিদ করবেন।

এদিকে খারাপ লোকেরা তো মহাখুশী। হাসানরা ব্যর্থ হয়েছে বলে তারা আরো জোরে শোরে প্রচার করতে লাগলো।

বিরোধীতায় ধৈর্য্য ধারণ

যুগে যুগে যারা ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন একদল লোক তাদের পেছনে লেগে থাকে। সমস্ত নবী-রাসূলের বিরুদ্ধে এ ধরনের লোক কতই না আজে বাজে কথা বলেছে। এমনকি তারা নবীদের মারধর করে অনেককে মেরেও ফেলেছে। নবীরা তবুও ভাল কাজের দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত হননি। এধরনের লোক হাসানদের পেছনেও লাগলো। তারা ইখওয়ান সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলতে লাগলো। কিন্তু হাসান আর তার বন্ধুরা এসব বাজে কথায় দমে গেলেন না। তিনি সকলকে বোঝালেন, দাওয়াতের কাজ করলে এরকম বিরোধীতা সইতে হবে। কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেছেন, মানুষ কি একথা ভেবেছে যে আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করা হয়েছে।

চাঁদা সংগ্রহ

হাসান চাঁদা সংগ্রহ শুরু করেন। তার সাথে হামেদ আসকারিয়াকে নিলেন। তিনি মানুষের ঘরে ঘরে আর দোকানে দোকানে ঘুরলেন। আরেকজন লোক এব্যাপারে অনেক সাহায্য করেন। তার নাম শায়খ মুহাম্মদ হোসাইন মামলুত। তিনি নিজেই ৫শ' পাউন্ড দান করেন।

জমি ক্রয়

এরপর তারা জমি খুঁজতে থাকেন। ইসমাঈলিয়ার আরব মহল্লার শেষ মাথায় তারা একখন্ড জমি পেলেন। মসজিদ করার জন্য তারা সেটা কিনলেন। জমির দলিলে দু'জন সই দিলেন। একজন হলেন, শায়খ মুহাম্মদ হোসাইন মামলুত আর একজন হলেন, হাজী হোসাইন মুলি। হাসানরা মসজিদ আর মাদ্রাসা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর নামকরন করা হল দারুল ইখওয়ান বা ইখওয়ান ভবন। সকলেই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার জন্য হাসানকে ধরলেন। কিন্তু তিনি বিনয় নম্রতার সাথে সে প্রস্তাব নাকচ করলেন। শেষে হাসানের কথা মত শায়খ মুহাম্মদ হোসেন মামলুতকে এ কাজের জন্য ঠিক করা হল। তিনি একদিকে নেককার ভাল লোক। আবার ধনী লোক। দু'টো জিনিষ একই সাথে তার মধ্যে রয়েছে। নির্ধারিত দিনে এক বিরাট প্যান্ডেল খাটানো হল। বহু লোক জমায়েত হল। বিরাট ধুমধামের সাথে শায়খ মুহাম্মদ হোসাইন মামলুত এগিয়ে এসে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মসজিদ নির্মাণ ও মিথ্যা অপবাদ

মসজিদ নির্মান হয়ে যায়। খারাপ লোকেরা এতে আরো ক্ষেপে যায়। তারা হাসানদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ আনে। বেনামী দরখাস্ত লিখে তারা ইসমাঈলিয়ার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ও বড় বড় সরকারী কর্মকর্তার কাছে সেগুলো পাঠায়। কিন্তু এসব লোক হাসানকে খুব ভাল ভাবেই চেনেন। হাসান সম্পর্কে খারাপ কথা বললেও তাতে কোন লাভ হলনা। কেননা হাসান একজন ভাল লোক। তিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকেন। যারা তার দলে আসে তারা খারাপ থেকে ভাল হয়ে যায়। কাজেই এসব দরখাস্তে কোন কাজ হলনা। তখন তারা একটা দরখাস্ত প্রধানমন্ত্রী সেদকি পাশার কাছে পাঠাল। এই দরখাস্তে কিছু অধিবাসীর সই নেয়া হল। দরখাস্তে মিথ্যা কথা লেখা হল। যেমন- এখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা হাসান একজন কমিউনিস্ট। মস্কো থেকে তিনি টাকা পয়সা পান। তিনি আর তার দলবল একটা মসজিদ আর কেন্দ্র তৈরী করেছেন। তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এ জন্য টাকা পয়সা নেয়নি। এত টাকা তারা পায় কোথা থেকে? হাসান সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তিনি বলেন নির্বাচন ঠিক হয়নি। দেশের সংবিধান ভুল। এরকম ১২ রকমের অভিযোগ। হাসান একথা জানতে পেরে অবাক হয়ে যান। তিনি ভেবে পাননি কিভাবে এসব লোক এত মিথ্যা কথা বলতে পারে। হাসান নাকি বাদশাহ ফুয়াদের নামে যা তা বলেন। তিনি বলে থাকেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ কখনো রাষ্টের কোষাগার থেকে এক পয়সাও নেননি। আর বর্তমান কালের শাসকরা অবৈধ ভাবে প্রজাদের সম্পদ লুটে নিচেছ।

হাসানকে কমিউনিষ্ট অপবাদ দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর পত্র

সেদিন ভোরে ক্লাস। হাসান ক্লাস নিতে যাচেছন। এমন সময় স্কুলের প্রিন্সিপাল ওস্তাদ আহমদ হাদী সাহেবকে তার রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলেন। এভাবে আর কোনদিন তাকে দাঁড়াতে দেখেননি হাসান। আবার তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন। কাজেই হাসান ক্লাসে না ঢুকে তার কাছে গিয়ে বললেন,

-আস্সালামুআলাইকুম, শুভ সকাল।

-ওয়াআলাইকুমুসসালাম, শুভ সকাল।

-আল্লাহর রহমতে ভালো তো?

-হ্যাঁ ভালই আছি।

-কোন কথা আছে কি?

-ব্যাপারটা ক্রিমিনাল কোর্টের। আমরা সবাই জড়িয়ে গেছি।

-কি ভাবে এই ক্রিমিনাল কোর্টে তলব করা হল?

- প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রীর কছে একটি পত্র এসেছে। সে পত্রে বলা হয়েছে, আপনি কমিউনিষ্ট। আপনি বর্তমান সরকার ও বাদশাহের বিরোধী।

- শুধু এতটুকুই। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর কসম-আমরা নিরপরাধ। সুরা হজ্জের ৩৮নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, আল্লাহ অবশ্যই ঈমানদারদের হেফাজত করবেন। নিশ্চয়ই অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতকদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না। কাজেই আপনি অযথা ভাববেন না। ব্যাপারটা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন।

হাসান ক্লাশ নিতে চলে গেলেন। প্রিন্সিপাল সাহেব বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শিক্ষামন্ত্রীর পত্রে হাসানের ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলা হয়েছে। হাসান যা কিছু পড়ান সে সব ব্যাপারেও খোঁজ নিতে হবে। এখওয়ানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কাজকর্ম সম্বন্ধেও খোঁজ নিতে হবে। এসব বিষয়ে তাঁকে রিপোর্ট দিতে হবে। প্রিন্সিপাল সাহেব স্থানীয় আদালতের জজ পুলিশ অফিসার ও গুরুত্বপূর্ণ লোকদের কাছ থেকে হাসান সম্পর্কে মতামত নিলেন। ছাত্রদের কপি ঘাঁটাঘাটি করে তিনি রচনা দেখতে পেলেন। তাতে বাদশাহ ফুয়াদের সুয়েজ খাল সফর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রচনায় বাদশাহ ফুয়াদের প্রশংসা করা হয় এবং তার ভাল কীর্তির কথা উল্লেখ করা হয়। প্রিন্সিপাল সাহেব তার রিপোর্টে এরচনার উল্লেখ করেন।

পুলিশের রিপোর্ট

ইসমাঈলিয়ার পুলিশের বড় অফিসার ছিলেন ক্যাপটেন শরীফ নাবায়ুসি। হাসান সম্পর্কে তাঁকেও রিপোর্ট দিতে বলা হয়। হাসান সম্পর্কে তিনি জানতেন। কিন্তু সরকারী পত্রে হাসান সম্পর্কে যেসব মিথ্যা কথা বলা হয়েছে তা দেখে তিনি অবাক হলেন। এক দিন সুয়েজ কোম্পানীর একজন ফরাসী কর্মচারী সেখানে এলেন। তিনি ক্যাপটেন শরীফের অস্থিরতা দেখে বললেন,

-আপনাকে বেশ পেরেশান মনে হচেছ- ব্যাপার কি?

-এই যে এখানকার সরকারী স্কুলের একজন শিক্ষক -হাসান- যিনি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকেন -তার সম্পর্কে কিছু বাজে লোক খারাপ রিপোর্ট করেছে। এখন আমাকে সত্য কথা জানাতে হবে। কিভাবে লিখবো তাই ভেবে পাচিছনা-

-ও এই ব্যাপার। হাসানকে তো আমি চিনি। আমি নিজেই দেখেছি বাদশাহ ফুয়াদ যখন ইসমাঈলিয়ায় আসেন সেদিন হাসান শ্রমিকদের

বলেছিলেন, তোমরা সেখানে গিয়ে বাদশাহকে অভিনন্দন জানাবে। বিদেশীরা যেন বুঝতে পারে আমরা আমাদের বাদশাকে সম্মান করি। এতে বিদেশীদের কাছে আমাদের মর্যাদাও বেড়ে যাবে।

-সত্যি বলছেন আপনি?

-জ্বি হ্যাঁ! আমি তো তখন সেখানে ছিলাম।

- তা'হলে তো ভালই হল। আপনি দয়া করে একথাগুলো লিখে দিন।

- হ্যাঁ আমি নিজের চোখে দেখা ঘটনার কথা এখনই লিখে দিচিছ।

তাঁর নাম ছিল মসিয়ে তাওফিক ক্রুজ। তিনি লিখিত সাক্ষ্য দেন। সেটা ক্যাপটেন শরীফ নথিভুক্ত করেন। আরেকজন পুলিশ অফিসার ইখওয়ান সম্পর্কে রিপোর্ট লিখলেন। তাতে বলা হ'ল পুলিশও যেসব লোককে খারাপ কাজ আর অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনা - তারাই আবার ইখওয়ানের ডাকে সাড়া দিয়ে অপরাধ ছেড়ে দিয়ে ভাল হয়ে গেছে। একারণে সরকারের উচিত ইখওয়ানদের সাহায্য করা আর সারা দেশে ইখওয়ানের শাখা প্রতিষ্ঠা করা।

ইন্সপেক্টরের ইখওয়ানের কাজে অংশগ্রহণ

তদন্ত রিপোর্টের বিরাট ফাইল শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে পাঠানো হয়। কিছুদিন পর ইসমাঈলিয়ার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল আলী বেক কিলানি হাসানদের স্কুলে এলেন। তিনি দ্বিতীয় পিরিয়ডে হাসানের ক্লাশে গেলেন। তার সঙ্গে প্রিন্সিপালও ছিলেন। তিনি হাসানের পাঠদান শুনলেন। এরপর হেসে জিজ্ঞেস করলেন,

-ইনিই কি ওস্তাদ হাসান?

-জ্বি হ্যাঁ।

তাঁরা দু'জনে ক্লাশ থেকে চলে গেলেন। ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রিন্সিপালের রুমে ছিলেন। হাসান সেখানে গিয়ে সালাম করলেন। তিনি কাছে ডেকে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করলেন। হাসান তাকে ইখওয়ানের মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মাণের কাজ দেখার আমন্ত্রন জানান। তিনি যেন নিজের চোখে ইখওয়ানের দাওয়াত ও অন্যান্য কাজ দেখেন।

তিনি বিকেলে ইখওয়ান ভবনে আসেন। একটা সাদা সিধে ধরনের চায়ের আসর হল। এতে শহরের বিশিষ্ট লোকজন ও সরকারী কর্মকর্তাদের দাওয়াত দেয়া হয়। ইখওয়ানের বক্তারা বক্তৃতা দিলেন। আর হাম্‌দ ও নাত পরিবেশন করা হল। মেহমানরা ইখওয়ানের বক্তাদের পরিচয় জেনে অবাক হয়ে গেলেন।

বক্তাদের মধ্যে কেউ ছিলেন রাজমিস্ত্রি। কেউ ছিলেন বাগানের মালি আবার কেউবা ধোপা। ইন্সপেক্টর জেনারেল আলী বেক কিলানী অনুষ্ঠান দেখে খুবই মুগ্ধ হন। তিনি ইখওয়ানের ব্যাজ নিয়ে নিজের কোটে লাগালেন। ব্যাজপরে তিনি ইখওয়ানে যোগদানের ঘোষনা দেন। শিক্ষা বিভাগে তাঁর চাকুরীর মেয়াদ ছিল আর কয়েক মাস। এর পর তিনি অবসর নেবেন। তখন তিনি দাওয়াতের কাজ করার ওয়াদা করেন। কিন্তু অবসর গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন। যে ক'দিন বেঁচে ছিলেন ইখওয়ানের কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

জৈনিক খৃষ্টানের মিথ্যা অভিযোগ

হাসানের বিরুদ্ধে যে সব নালিশ করা হয় তার একটিতে একজন খৃষ্টানের সই ছিল। খৃষ্টানের অভিযোগে বলা হয়, হাসান ইখওয়ানুল মুসলিমুনের প্রধান। তিনি ক্লাশে খৃষ্টান আর মুসলমান ছেলেদের ব্যাপারে বৈষম্য করেন। খৃষ্টান ছাত্রদের তুচছ জ্ঞান করেন। তাদের শিক্ষার প্রতি কোনই মনোযোগ দেন না। মুসলমান ছাত্ররাই তার প্রিয়। তাদের ভালভাবে পড়ান। বিষয়টি তদন্তের জন্য প্রিন্সিপালের কাছে পাঠানো হল। সেখান থেকে সকলেই তা'জানতে পারলো। ইসমাঈলিয়ার খৃষ্টান অধিবাসীরা হাসানকে ভালবাসেন। তারা হাসানের মধ্যে সে রকম কোন দোষ দেখেননি। কাজেই তারা ঐ পত্রের নিন্দা করলেন। স্থানীয় গীর্জার পক্ষ থেকে অভিযোগ মিথ্যা বলে জানানো হয়।

ইখওয়ান ভবনের উদ্বোধন

বেশ জাঁকজমকের সাথে মাহফিলের আয়োজন করে ইখওয়ান ভবনের উদ্বোধন হয়। মসজিদের উদ্বোধন করেন ওস্তাদ আহমদ সাকারি। তিনি মাহমুদিয়ায় ইখওয়ানের প্রধান। অথচ সকলে দাবী করেছিল হাসান-ই যেন উদ্বোধন করেন। কিন্তু এতে হাসানেরও মত ছিলনা। হাসান ওস্তাদ হামেদ আসকারিয়াকে মেহরাবের দিকে ঠেলে দেন। তিনি এ মসজিদে প্রথম ইমামতি করেন। এই মসজিদ নির্মানের পর শহরে আরো বহু মসজিদ নির্মিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা সম্বলিত মান-পত্র পাঠে আপত্তি

মিশরের প্রধানমন্ত্রী সেদকি পাশা সিনাই সফর করেন। এ জন্য তাকে ইসমাঈলিয়া হয়ে যেতে হবে। খবর পেয়ে সরকারের বিভিন্ন স্তরে তোলপাড় শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি চলতে থাকে। ডেপুটি কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটও সেখানে আসেন। বিপুল সংখ্যক লোক সেখানে সমবেত হয়। প্রধানমন্ত্রীকে কে সংবর্ধনা জানিয়ে বক্তৃতা করবেন সেটা নিয়ে আলোচনা হল। শেষে এ কাজের জন্য হাসানকে বাছাই করা হল। হাসানকে ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস

তলব করা হল। ম্যাজিস্ট্রেট সাবের বেক তানতাবি হাসানের সাথে এ বিষয়ে কথা বললেন। পুলিশ অফিসার ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরাও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। এতে হাসান বেশ রেগে গেলেন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন,

- আমি এখনই চাকুরীতে ইস্তেফা দেব। আপনারা কি মনে করেন সরকারী কর্মচারীরা কাঠের পুতুল। তাদেরকে ইচেছ মত নাচানো যায়।

- আপনি রেগে যাচেছন কেন- শান্ত হন। আপনার কথা আমরা শুনছি বলুন।

- দেখুন, শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের সাথে আমার যে চুক্তি হয়েছে তা' কেবল এতটুকুই যে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি উন্নত সেবা করে যাব।

- তা'ছাড়া প্রয়োজনবোধে অন্যান্য সরকারী কাজও করা যাবে।

- কিন্তু চুক্তিতে এমন কথা কোথাও লেখা নেই যে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে মানপত্র পড়তে হবে।

- ঠিক আছে আপনার অসুবিধা থাকলে আমরা এ কাজের জন্য অন্য লোক ঠিক করবো।

হাসানের প্রচন্ড আপত্তির কারণে এ কাজের জন্য অন্য লোক ঠিক করা হল।

মসজিদের জন্য সুয়োজ কোম্পানীর সাহায্য

মসজিদের জন্য সুয়েজ কোম্পানীর পরিচালক ব্যারন ডা বেনো ৫শ' মিশরীয় পাউন্ড দিলেন। এজন্য তিনি মসজিদের প্রকল্প, নকশা ও অন্যান্য বিবরণ দেখেন। হাসান তাকে বললেন,

-আমরা কোম্পানীর কাছ থেকে এত কম সাহায্য আশা করিনি।

- আমার কিছু করার নেই। এটা কোম্পানীর সিদ্ধান্ত।

-দেখুন কোম্পানীর খরচে একটা গীর্জা তৈরী হচেছ। তাতে ব্যয় হচেছ ৫ লাখ পাউন্ড।

- আপনার কথা মানলাম- কিন্তু আমি দুঃখিত আমার কোম্পানীর পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মসজিদের কোষাধ্যক্ষ শায়খ মুহাম্মদ হোসাইন মমলুত কোম্পানীর কাছ থেকে ৫'শ পাউন্ড গ্রহন করলেন।

আল হেরা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা

মসজিদ তৈরী হল। তার ওপরে বিদ্যালয় হল। শিশুদের জন্য ইসলামী পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করলেন হাসান। বিদ্যালয়ের নাম রাখা হল আল

হেরা শিক্ষালয়। ছাত্রদের জন্য ইউনিফর্ম ঠিক করা হল। দেশী কাপড়ের তৈরী লম্বা জামা ও কোট, সাদা টুপি আর জুতাই হল এই ইউনিফর্ম। বিদ্যালয় ফজরের নামাজের পর শুরু হয় আর জোহরের নামাজ পর্যন্ত চলে। ছাত্ররা জামায়াতে জোহরের নামাজ আদায় করে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে আসরের পূর্বে ফিরে এসে জামায়াতের সাথে আসরের নামাজ আদায় করে। ছাত্রদের দিনের প্রথম ভাগে আল আজহারের পাঠ্য সূচী অনুযায়ী শিক্ষা দেয়া হয়। দিনের দ্বিতীয় ভাগে শিল্পকার্য শিখানো হয়। দুপুরের খাবারের পর ছাত্ররা শহরে যায়। সেখানে ইখওয়ান কর্মীদের কারখানা ও ওয়ার্কশপে তাদের ট্রেনিং দেয়া হয়। এভাবে তারা লেখাপড়ার পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষাও নেয়। এছাড়া ছাত্রদের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ শিক্ষা দেয়া হয়। এতে তাদেরকে মাধ্যমিক ও উচচমাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হয়। ছাত্রদের বেতন ধরা হয় খুবই কম। বিনা বেতনেও অনেক ছাত্র নেয়া হয়। উচচ শিক্ষিত ও প্রশিক্ষন প্রাপ্ত শিক্ষকদের এই বিদ্যালয়ে নিয়োগ দেয়া হয়। মানুষের মধ্যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এখানে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয়। ইসমাঈলিয়ায় রয়েছে সুদর্শন পার্ক। পার্কে গাছের ছায়াতলে বসেও অনেক সময় ছাত্রদের ক্লাশ নেয়া হয়। মাটি পাথর আর কাগজের টুকরার সাহায্যে বর্নমালা আর অংকের বুনিয়াদি বিষয় শেখান হয়। ছাত্ররা অবাধে শিক্ষকদের প্রশ্ন করে থাকে। ছাত্র আর শিক্ষদের মধ্যে সৃষ্টি হয় সহযোগিতা আর ভালবাসার সম্পর্ক। হাসান তাঁর নিজের স্কুলের ফাঁকে ফাঁকে আল হেরায় ছুটে যান। আর ক্লাস নেন।

তিনি শিক্ষদেরও উপদেশ দেন। ছাত্রদের সাথে তিনিও বাগানে যান। আর দু'ঘন্টা তাদের সাথে কাটান। এসময় ভ্রমন বিনোদনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এতে করে ছাত্ররা যথেষ্ট আনন্দ পায়। বিকালে ছাত্ররা ইচছামত খেলাধুলা করতে পারে। ইছছা করলে হাসি খুশী আর খোশ গল্পও করতে পারে। হাসানও তাদের সাথে এসময় মিশে যান। তাদের পরিবারিক খোঁজ খবর নেন। সুখ দুঃখের অংশীদার হন। ছাত্ররা যাতে মনে করতে পারে শিক্ষকরা তাদের আপন পিতা বা ভাইয়ের মতই। সেভাবে ব্যবহার করার জন্য হাসান শিক্ষকদের অনুরোধ জানান। তার অনুরোধে কাজ হয়। অনেকেই তার কথা মেনে নেয়। এর ফলে তারা ভাল শিক্ষকে পরিনত হয়।

আলহেরা নামটি রাখার প্রস্তাব করেন শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ ওরফী। তিনি একজন বড় আলেম ও সিরিয়ার পার্লামেন্ট মেম্বার। ফরাসীদের জুলুম নির্যাতনের

প্রতিবাদ করায় তাকে নির্বাসন দেয় হয়। এর ফলে তিনি মিসরে এসে কায়রোতে বাস করতে থাকেন। হাসানের সাথে তার পরিচয় হয়। তিনি রাত জেগে ইবাদত করেন। দিনের বেলায় জ্ঞান বিতরনের কাজ করেন। তাঁর কাছে জ্ঞান লাভের জন্য অনেকে আসেন। একবার তিনি ইসমাঈলিয়ায় এলেন। হাসানের সাথে কয়েকদিন কাটলেন। এসময় তিনি জানতে পারলেন, হাসানরা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে চাচেছন। এটা হবে ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেটি হবে ইখওয়ানের একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর ইখওয়ানের দাওয়াততো কোরআনেরই দাওয়াত। আল কোরআন সর্ব প্রথম হেরা গুহাতেই নাজিল হয়েছে। কাজেই তিনি প্রস্তাব দিলেন এই শিক্ষালয়ের নাম আল হেরা রাখা হোক। তার প্রস্তাব সকলে মেনে নেয়। কাজেই আল হেরা নামই রাখা হল। সেদিন শায়খ ওরফি হাসানকে বললেন।

- ভাল ভাল নাম আর উপাধিতে ধন্য করো।

- কাকে ধন্য করবো?

- তোমার ভাই বন্ধু, সঙ্গী ও প্রতিষ্ঠানকে ভাল নাম আর উপাধিতে ধন্য কর।

- সেটা কি ভাবে করবো?

- তোমার একজন বন্ধুকে বলবে, আরে তোর মধ্যে হযরত আবু বকরের (রাঃ) মত গুন দেখা যাচেছ - আরেকজনকে বল, তোমার মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) এর মত গুন রয়েছে।

- বললে কি লাভ হবে?

- এতে তাদের মধ্যে আত্ম মর্যাদাবোধ জেগে উঠবে। তারা আদর্শ চরিত্র আর সৎ নমুনা অনুযায়ী চলার চেষ্টা করবে।

- আমরা এরকম ভাবে বললে লোকেরা আমাদের কড়া কথা শোনাবে।

- লোকের কথায় কান দিওনা। তুমি আল্লাহর হয়ে যাও। আল্লাহ তোমার হয়ে যাবেন। যে কাজে কল্যান আছে সে কাজ করতে থাক।

- প্রতিষ্ঠানের নাম আমরা কি কি রাখতে পারি?

- ইসলামের ইতিহাসের স্মরণীয় নাম বেছে নিয়ে রাখতে পার। যেমন আল হেরা বালক বিদ্যালয়। উম্মাহাতুল মুমিনুন বালিকা বিদ্যালয়, ফুন্দক ক্লাব ইত্যাদি।

শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ ওরফি যতদিন মিসরে ছিলেন নিজের হাতে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তিনি বই পত্র সম্পাদনা ও সংশোধন করে যা কিছু বাঁচতো সেগুলো ইখওয়ানের তহবিলে দান করতেন। তিনি ইখওয়ানদের

ভালবাসতেন। তাদের সঠিক পথে চলার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি গুনাহগার ও ইবাদতে গাফেল লোকদেরও ইখওয়ানে নেয়ার আহবান জানাতেন। তিনি বলতেন, ইখওয়ানুল মুসলিমুন হচ্ছে একটা হাসপাতাল। এখানে রোগী আসবে। আর আরোগ্য লাভ করে বাড়ীতে ফিরবে। দাওয়াত দ্বারাই মানুষ নিজের সংশোধন করতে পারে আর ভাল মানুষ হতে পারে। হাসান এসব কথা ভেবে দেখলেন। তিনি বুঝতে পারলেন শায়খ ওরফি ঠিক কথাই বলেছেন। তাই তিনি এই সব লোকদের দাওয়াত দিয়ে ইখওয়ানের মধ্যে আনতে শুরু করেন।

ইসমাঈলিয়ায় ইখওয়ানের শাখা গঠন

ইসমাঈলিয়া থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে আবু সবির ষ্টেশন। ইংরেজ সৈন্যদের ক্যাম্পের পরেই এই ষ্টেশন। হাসান আবু সবিরে গেলেন। উদ্দেশ্য মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে সংগঠিত করা। ইখওয়ানের শাখা প্রতিষ্ঠা করা। সেখানে কফি শপ, রাস্তাঘাট আর দোকানে দোকানে গিয়ে তিনি উপযুক্ত লোক খুঁজতে থাকেন। শেষে শায়খ মুহাম্মদ আল আজরূদীর দোকানে এলেন। তিনি একজন সৎ লোক। তিনি মানুষ জনের সাথে সুন্দর ভাবে কথা বলতে পারেন। তার কাছে কিছু লোক বসা ছিলেন। হাসান সালাম জানিয়ে সেখানে বসলেন। তিনি ইসলামের সুন্দর আদর্শের কথা আলোচনা করে বর্তমানে মুসলমানদের অন্যায় অনাচার আর খারাপ ভাবে জীবন যাপনের কথা তুললেন। ইসলামী আন্দোলন গড়ে তুলে এ সব অন্যায় দূর করা যাবে বলে হাসান মতামত দিলেন। এজন্য ইখওয়ানের প্রয়োজন। এ দলে ভালো লোকদের টানতে হবে। তারা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবে।

দোকানদার আর তার সঙ্গীরা বেশ মনোযোগের সাথে এসব কথা শুনলেন। হাসানকে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য আমন্ত্রন জানানো হল। হাসান খেতে রাজী হলেন না। তারা হাসানের কাছ থেকে আরো কথা শুনতে চাইলেন। এজন্য কফি হাউজে মাহফিল করার সিদ্ধান্ত হল। লোকজন কফি হাউজে সমবেত হল। সকলেই মন দিয়ে হাসানের কথা শুনলো। হাসানের কথাগুলো তাদের ভাল লাগে। তারা হাসানকে আবারো আসার জন্য অনুরোধ জানালো। হাসান পরে আবারো সেখানে গেলেন। মানুষের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কয়েকবার যাওয়ার পর সেখানে কিছু লোক তৈরী হল। পরে ব্যবসায়ী আহমদ আফেন্দি দাসুতির বাসায় সবাই সমবেত হলেন। হাসান আবু সবিরে ইখওয়ানের শাখা গঠন করলেন। প্রথমে আহমদ আফেন্দি দাসুতিকেই এ শাখার সভাপতি করা হয়। তিনি ব্যবসায়ের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ফলে ইখওয়ানের নেতৃত্ব

দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হল না। হাসান উপযুক্ত লোক খুঁজতে লাগলেন। শেষে ওস্তাদ আব্দুল্লাহ বাদবীকেই সভাপতির দায়িত্ব দেয়ার চিন্তা করলেন। তিনি আবুসবির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ওয়াজ নসিহত করতে পারেন। এছাড়া লোকজনও তাকে শ্রদ্ধা করে। সকলেই তাকে ভালবাসে। তাকেই সভাপতি করা হল। তিনি বেশ পরিশ্রম করে দাওয়াতের কাজ করতে থাকেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে সেখানে ইখওয়ানের শক্তিশালী শাখা গড়ে ওঠে।

পোর্ট সাঈদে ইখওয়ান

ইসমাঈলিয়ায় কিছুদিনের জন্য একজন যুবক আসেন। তাঁর নাম আহমদ আফেন্দি মিসরি। তিনি পোর্ট সাঈদের বাসিন্দা। ইসমাঈলিয়ায় থাকা কালে তিনি ইখওয়ানের কেন্দ্রে আসা শুরু করেন। সেখানে যেসব ওয়াজ নসিহত আর কোরআন হাদিসের আলোচনা হত তিনি তা' শুনতেন। কিছুদিন পরে তিনি ইখওয়ানের সদস্য হন। এরপর তিনি দাওয়াতের কাজে শরীক হলেন। এ কাজেও তিনি ভাল করেন। ইসমাঈলিয়ায় তার কাজ শেষ হলে তিনি পোর্ট সাঈদে ফিরে যান। সেখানে গিয়ে দাওয়াত দিতে থাকেন। তার বন্ধু বান্ধবরা সকলেই ইখওয়ানে যোগদান করেন। সেখানে দাওয়াতের কাজ বাড়তে থাকে। শেষে হাসানকে সেখানে যেতে হল। তিনি পোর্ট সাঈদের যুবকদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন, দাওয়াতের পথে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। হয় বিজয় আসবে হয়তো এ পথে শহীদের মৃত্যু হবে।

দারুল ইখওয়ান প্রতিষ্ঠা

পোর্ট সাঈদে আল মানইয়া সড়কে একটি ঘর ভাড়া নেয়া হয়। সেখানেই প্রতিষ্ঠা করা হয় দারুল ইখওয়ান। সেখানে কাজ বাড়তে থাকে। এক সময় ইখওয়ানরা সিদ্ধান্ত নিলেন তারা সাধারণ মানুষের কাছে দাওয়াত দেবেন। এজন্য সমাবেশ হল। এতে ইসমাঈলিয়া ও পোর্ট সাঈদের ইখওয়ান নেতারা বক্তৃতা করেন। আলোচনা হল নবী (সাঃ) এর হিজরত নিয়ে। এ মাহফিলে দলে দলে লোক যোগদান করে। এটাই ছিল সেখানে ইখওয়ানের প্রথম সমাবেশ। সেদিন হঠাৎ হাসান খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর গলায় ভীষন ব্যাথা। এতবেশী কষ্ট হচ্ছিল যে, কোথাও যাওয়ার মত অবস্থা তার ছিল না। এ কারণে তিনি ইসমাঈলিয়া থেকে পোর্ট সাঈদ পর্যন্ত রেল গাড়ীতে শুয়ে শুয়ে কাটান। স্কুলের পরিচালক মাহমুদ বেক হাসানের অবস্থা দেখে বললেন,

-আজ আপনার কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। আর বক্তৃতা করাও উচিত হবে না।

-কিন্তু আমি যাওয়ার ওয়াদা করেছি। তারা আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

-আপনার যে অবস্থা তাতে বাইরে বের হওয়াটা মোটেই উচিত নয়। যদি আপনি বের হন তবে তা হবে নিজের ওপর জুলুম করা।

-না। আমাকে ওয়াদা রক্ষা করতে হবে। আমি যাব।

ট্রেন থেকে নেমে হাসান সোজা দারুল ইখওয়ানে গেলেন। শরীরটা এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারলেন না। বসে বসে মাগরিবের নামাজ পড়তে হল। তিনি ভাবলেন, পোর্ট সাঈদের ইখওয়ানরা কতইনা কষ্ট করে এই সমাবেশের আয়োজন করেছে। এজন্যে তারা নিজেদের কষ্টের টাকা-পয়সা দান করেছে। লোকজনকে দাওয়াত দিতে ইখওয়ানরা কষ্ট করেছে।

এত কষ্ট করে যে সমাবেশ করা হল তার প্রধান বক্তাই যদি বক্তৃতা দিতে না পারে তবে অবস্থাটা কি হবে? এসব চিন্তা করে হাসান আবেগে কেঁদে ফেললেন। এখন কি উপায় হবে? তিনি এশার নামাজ পর্যন্ত কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে সুস্থতা লাভের জন্য দোয়া করলেন। এসময় তিনি বেশ সজীব বোধ করলেন। ফলে এশার নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করেন।

এশার পর মাহফিলের কাজ শুরু হয়। হাসান বক্তৃতা দিতে ওঠে দাঁড়ান। তিনি নিজের মধ্যে প্রচন্ড শক্তি অনুভব করলেন। মনে হল তিনি পুরাপুরি সুস্থ। তার আওয়াজ পরিষ্কার ও বোধগম্য। তখনো মাইকের প্রচলন হয়নি। সামিয়ানার নীচে এবং তার বাইরে যারা ছিল সবাই হাসানের কথা পরিষ্কার ভাবে শুনতে পেল। মাহফিল ভালভাবে শেষ হয়। হাসান দু'ঘন্টা বক্তৃতা করেন। তিনি আল্লাহর কাছে যে দোওয়া করেন তা কবুল হয়েছিল। তাই শুধু সেদিনই নয়, বরং সারা জীবনে তার ঐ রোগ আর হয়নি।

পোর্ট সাঈদে ইখওয়ানদের আন্তরিক চেষ্টায় দাওয়াতের কাজ বেড়ে গেল। সেখানে ইখওয়ানের চারটি মজবুত শাখা খোলা হল।

মাতরিয়া সফরে মজার ঘটনা

পোর্ট সাইদের সমাবেশে বাহরুস সগির-এর জামালিয়া অঞ্চলের এক দল লোক যোগদান করেন। তাদের মধ্যে জামালিয়া অঞ্চলের মাহমুদ আফেন্দি আব্দুল লতিফ এবং ওয়াকহিলার সিঙ্গার কোম্পানীর এজেন্ট ওমর তালামও ছিলেন। তারা হাসানকে তাদের অঞ্চলে সফরের আমন্ত্রন জানান। এসব এলাকায় ইখওয়ানের কয়েকটি শাখা খোলা হয়। হাসানের মাতরিয়া সফর কালে বেশ মজার একটি ঘটনা ঘটে। হাসানকে স্বাগত জানাতে সেখানে আল

মানজিলার গন্যমান্য একদল লোক উপস্থিত ছিলেন। তারা ভাবছিলেন, ইখওয়ানুল মুসলিমুনের মত দলের প্রধান একজন জাঁদরেল লোক হবেন। বিরাট লম্বা চওড়া দশাসই আকার হবে তার। বয়সতো তাঁর কম হবেনা। বেশ বয়স্ক হবেন। আর নামী দামী আলেম হবেন। চেহারা দেখলেই মনে হবে জীবন স্বার্থক, আজকে একজন মহান লোক দেখতে পেলাম। কিন্তু হাসানকে দেখে তারা অবাক হয়ে গেলেন। তাদের মুখে যেন এক তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠলো। দেখে মনে হল, এতো ২৫ বছরের এক যুবক। যার বয়সও কম। চেহারা হাল্কা পাতলা। পোশাক-পরিচ্ছদ সাদাসিধে । ওরকম লোক আর কি ওয়াজ নসিহত করবেন? তার বিরাট শরীর নেই। নেই কোন জাঁকজমক। ওদের বাঁকা হাসি দেখে হাসান চিন্তিত হলেন। ভাবলেন নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে। আল মানজিলা অঞ্চলের ইখওয়ান সভাপতি শায়খ মুস্তফা তাইরকে ডেকে হাসান লোকজনের হাসির কারন জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, লোকজন ভাবছিল, ইখওয়ান সভাপতি একজন প্রভাবশালী আর বিরাট দেহধারী কোন মাওলানা হবেন। কিন্তু বাস্তবে তারা দেখলো কম বয়সের এক হ্যাংলা পাতলা যুবককে। একারণেই তাদের এই হাসি। লোকজনের মধ্যে ইখওয়ান সম্পর্কে ভাল ধারনা দেয়ার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। এজন্য আমাদেরকে আজকে রাতের সমাবেশ সফল করতে হবে। একথা শুনে হাসান বললেন, ভাল ওয়াজ করার ক্ষমতা দেয়ার মালিক আল্লাহ। আর সফলতা দানের মালিকও তিনি। তিনি যদি ভাল করার ফয়সালা করেন তবে তাই হবে। মানুষের অন্তর আল্লাহর হাতে। তিনি ইচ্ছা করলেই মানুষের অন্তর ঘুরে যেতে পারে।

হাসান জলসায় বক্তৃতা শুরু করেন। শামিয়ানার নীচে লোকজন কানায় কানায় পূর্ণ। যতদূর নজরে পড়ে শুধু মানুষ আর মানুষ। হাসান যে কথা বলেন তা' তার অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে। তার কথার মধ্যে কোন কপটতা নেই। তার বক্তৃতায় মানুষ একজন খাঁটি মুসলমানের কথা শুনতে পায়। ফলে সমবেত লোকজন মুগ্ধ হয়ে যায়। লোকজন বক্তৃতা শেষে তার কাছে এসে বললেন, এতদিন পর আমরা একজন খাঁটি মানুষ দেখলাম। আগে ভেবেছিলাম বিরাট দেহ ধারী কোন মাওলানা সাহেবকে দেখতে পাব। কিন্তু এখন দেখলাম একজন খাঁটি আল্লাহওয়ালা মানুষকে। পরে এসব অঞ্চলে ইখওয়ানের আরো শাখা খোলা হয়।

মেন্দি পাতার ঘটনা

একবার দাওয়াতের কাজে হাসান সুয়েজ খাল অঞ্চল সফরে গেলেন। সুয়েজের এক ইখওয়ানের বাড়ীতে তিনি উঠলেন। তার রুমের ভেতর একটি

টেবিল। টেবিলের ওপর রাখা ছিল একটি বই। নাম 'সিফরুস সাআদাহ'। হাসান বইটি হাতে নিলেন। খোলা মাত্রই নজরে পড়ে একটি হাদিসের দিকে। এতে বলা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) মেন্দি পাতা পছন্দ করতেন। হাসান একথা জানতে পেরে মেন্দিপাতার প্রতি আগ্রহবোধ করলেন। কিন্তু এখানে তিনি মেন্দি পাতা পাবেন কোথায়? কে দেবে তাকে মেন্দিপাতা। তিনি নিজ শহর আর পরিবার থেকে বহু দূরে রয়েছেন। এর কিছুক্ষন পরে তিনি ইখওয়ান কেন্দ্রে গেলেন। সেখানে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। হাসানের পেছনে একটি জানালা ছিল। হঠাৎ একটি বালক শায়খ হাদি আতিয়াকে ডাক দেয়। তিনি তার কাছে গেলেন। সে তার হাতে মেন্দি গাছের একটা বড় ডাল তুলে দিয়ে তা হাসানকে দিতে বললেন। শায়খ হাদি ডালটি হাসানের হাতে দিয়ে বললেন, আপনার জন্য এটা এখানকার শিশুদের উপহার। হাসান বুঝতে পারলেন, আল্লাহ্ তার মনের আশা পূরনের জন্য এ ব্যবস্থা করলেন। তিনি মৃদু হেসে বললেন, এটা শিশুদের উপহার নয়। এটা হচেছ আল্লাহুর রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসার একটি প্রতিদান।

আসল কথা হল, আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি খাঁটি ভালবাসা থাকলে তার মনের কোন আশাই অপূর্ন থাকে না। আল্লাহ্ তার আশা পূর্ন করে থাকেন। এই ঘটনায় হাসানের সমস্ত মনপ্রান আনন্দে ভরে গেল।

কায়রোতে ইখওয়ান অফিস

কায়রোতে দু'জন সৎ যুবক ইসলামের দাওয়াতের কাজ করার জন্য জমিয়তে হাদারাতে ইসলামিয়া বা ইসলামী সংস্কৃতি সংস্থা নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন। তারা রোম মহল্লার একটি ভবনের নীচের তলায় একটি রুম ভাড়া নেন। সেখানেই দলের কাজ চালাতে থাকেন। এ সময় অনেক জ্ঞানী- গুনী লোক তাদের সাথে যোগ দেন। তারা ইসমাঈলিয়ার ইখওয়ানদের কথা শুনেছিলেন। ইখওয়ানের কাজ কর্ম তারা ভালভাবে দেখলেন। ভাবলেন, আলাদা আলাদা দল না করে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকা দরকার। এর ফলে হাসানের সাথে তাদের কথাবার্তা হল। তারা ইখওয়ানের সাথে এক হয়ে গেলেন। ফলে তাদের দলের দপ্তরই ইখওয়ানের শাখায় পরিনত হল। পরে কায়রোর সালাখ বাজার সড়কে সলিম পাশা হেজাজির বিল্ডিং এ একটি রুম ভাড়া নিয়ে সেখানে অফিস করা হল। কিন্তু মিসরের রাজধানী কায়রোতে ইখওয়ানের অফিস যে রকম হওয়া দরকার তা হয়নি। এর জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা ছিল না। ফলে ইসমাঈলিয়া থেকে কায়রো অফিসের জন্য টাকা পয়সা পাঠানো হত।

সরকারের পক্ষ থেকে ইখওয়ানকে টাকার লোভ

১৯৩২ সালের কথা। হাসানকে কায়রোতে বদলি করা হল। তিনি কায়রোতে চলে এলেন। এর ফলে ইখওয়ানের হেড অফিসও কায়রোতে সরানো হল। এসময় কায়রোতে একটি স্মরনীয় ঘটনা ঘটে। তখন সবে মাত্র দাওয়াতের কাজ শুরু হয়েছে। কায়রোর অফিসের খরচ ইসমাঈলিয়া থেকে আসে। এ সময় ইখওয়ানকে অনেক টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য দানের জন্য সরকার থেকে প্রস্তাব দেয়া হল। এর বিনিময়ে সরকারের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে আর সরকারের পক্ষে কাজ করতে হবে। এ সময় সিদকি পাশা প্রথমবারের মত মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। তার পক্ষ থেকে যখন এই প্রস্তাব এল তখন হাসানের দু'বছরের ছোট ভাই আব্দুর রহমান সায়াতি জবাবে বললেন, আমাদের হাত কেটে ফেললেও আমরা এমন টাকা পয়সা নেবনা। কেননা এই টাকা পয়সা দেয়ার উদ্দেশ্য হচেছ ইসলামী আন্দোলনকে ব্যক্তি স্বার্থের নিয়ন্ত্রনে আনা। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের কাজকর্ম ইসলামী বিধান অনুযায়ী হলে আমরা জানমাল দিয়ে তাদের পক্ষে কাজ করতাম। কিন্তু তা তো হচেছ না। এ কারণে টাকা পয়সার বিনিময়ে আমরা সরকারের সব কাজের প্রতি অন্ধভাবে সমর্থন জানাতে পারিনা।

ইখওয়ানকে টাকা পয়সা দিয়ে বশ করার সরকারী চেষ্টা ব্যর্থ হল। অথচ তখন ইখওয়ানের প্রাথমিক অবস্থা। কয়েকজন যুবক আর সরকারী কর্মচারী নিয়েই কায়রোতে ইখওয়ান গড়ে ওঠে। কিন্তু শুরু থেকে ভেজাল মুক্ত থাকায় ইখওয়ান খালেস আল্লাহ্‌র দলে পরিণত হয়।

মহিলা অঙ্গনে ইখওয়ান

ইসমাঈলিয়ায় বালকদের জন্য আল হেরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ভালভাবে দাঁড়াবার পর হাসান বালিকাদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পড়ে তোলার চিন্তা-ভাবনা করলেন। মেয়েদের এই প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হল, 'উম্মাহাতুল মুমেনীন মাদ্রাসা'। এর জন্য একটা বিরাট বিল্ডিং ভাড়া নেয়া হল। একদিকে ইসলামী শিক্ষা আর একদিকে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা এ দুটোই পাঠ্য সূচীতে রাখা হল। ইসমাঈলিয়ার দক্ষ অভিজ্ঞ মহিলাদের এ মাদ্রাসার শিক্ষিকা হিসেবে নেয়া হল। মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হলেন ওস্তাদ আহমদ আবদুল হালিম। তিনি একজন দ্বীনদার পরহেজগার লোক। তিনি ইখওয়ানেরও একজন ভাল কর্মী। মাদ্রাসাটির ভার পরে শিক্ষা বিভাগ গ্রহন করে। কিছুদিন পর ইখওয়ানের মহিলা শাখা গঠন করা হল। এর নাম রাখা হয় 'আল আখাওয়াত আল মুসলিমাত'। ইখওয়ান কর্মীদের স্ত্রী, বোন, মেয়ে আর আত্মীয়স্বজনেরা এর

সদস্যা হন। হাসান এদের বলতেন, মুসলিম বোনদের গ্রুপ। মহিলাদের মধ্যে ইসলামী দাওয়াতের কাজ করার জন্য এই গ্রুপটি গঠিত হল।

স্কাউট গ্রুপ গঠন

প্রতিটি মুসলমানই মুজাহিদ। এদিকে ঈমান আনার পর তার ওপর নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত যেমন ফরজ তেমনিই জেহাদও তার জন্য করনীয় কর্তব্য। হাসান এ সম্পর্কে কোরআন ও হাদিসে অনেক প্রমান দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন, এজন্য রাসূল (সাঃ) এর একটি হাদিসই যথেষ্ট। হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে সে জিহাদ করেনি আর মনে মনে জিহাদের নিয়তও করেনি সে ব্যাক্তি জাহেলিয়্যাতের মৃত্যু বরণ করে।

ইখওয়ানের মধ্যে স্কাউট গ্রপ করা হল। তারা শারীরিক ব্যয়ামের অনুশীলন শুরু করে। এর নাম রাখা হয় কিরআতুর রিসলাত বা ট্যুরিস্ট স্কাউট্স গ্রুপ।

শ্রমিক সমাজে ইখওয়ান

জাবাসাত এর কিছু শ্রমিক ইসমাঈলিয়ায় ইখওয়ানের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়। তারা জাবাসাতে ফিরে গিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করতে থাকে। ফলে হাসানকে জাবাসাতে সফরে যেতে হয়। সেখানকার শ্রমিকরা ইখওয়ানের সদস্য হয়। এর কিছুদিন পর শ্রমিকরা সুয়েজ কোম্পানীর কাছে একটা মসজিদ নির্মানের দাবী জানায়। কারণ সেখানে মুসলমান শ্রমিকের সংখ্যা ৩ শতাধিক। কোম্পানী দাবী মেনে নিয়ে মসজিদ নির্মান করে। মসজিদে ইমামতির জন্য একজন লোক পাঠানোর জন্য ইসমাঈলিয়ায় হাসানের কাছে লোক পাঠানো হল। এ কাজের জন্য বিশিষ্ট আলেম মুহাম্মদ ফারগালীকে পাঠানো হল। তিনি তখন আল হেরা মাদ্রাসার শিক্ষক।

শায়খ ফারগালী জাবাসাত আল বালাহতে গিয়ে মসজিদের ইমাম হলেন। তিনি শ্রমিকদের কাছে ইসলামের সত্যিকার রূপ তুলে ধরলেন। তিনি বললেনঃ মুসলমান হলে তার মধ্যে ঈমান থাকতে হবে। সে সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করবে। আবার সঠিক ভাবে নামাজ রোজা ও অন্যান্য এবাদত করবে। মুসলমান আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহর হুকুম সে ঠিক ঠিক ভাবে মেনে চলবে। শায়খ ফারগালীর কথা শুনে শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি হল। এসব দেখে শুনে কোম্পানীর অফিসাররা ভয় পেলেন। তারা ভাবলেন, এ অবস্থা চলতে থাকলে একদিন শ্রমিকরা কোম্পানীর কর্তৃত্ব শায়খ ফারগালিকেই দিয়ে দেবে। এ কারণে তারা মসজিদ থেকে তাকে চলে যেতে বলল। কিন্তু তিনি তা মানলেন

না। শেষে তারা হাসানের সাথে যোগাযোগ করলো। হাসান দু'মাস সময় নিলেন। পরে ইসমাঈলিয়া থেকে আরেক জন্য আলেম পাঠানো হল। তার নাম শায়খ শাফেয়ী আহমদ। তাকে দায়িত্ব দিয়ে শায়খ ফারগালি ইসমাঈলিয়ায় চলে এলেন।

খোলা ময়দানে ঈদের নামাজ আদায়

রমজানের রোজার দিনে হাসান আব্বাসী মসজিদে ফজরের নামাজের পর নামাজ রোজা ও রমজানের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করেন। ঈদের নামাজ খোলা মাঠে আদায় করা উত্তম। এ ব্যাপারে ইসলামের সব ঈমাম একমত। তবে ইমাম শাফেয়ী বলেন, ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা উত্তম। শর্ত হচ্ছে শহরের ভিতর এতবড় মসজিদ থাকতে হবে। যেখানে শহরের সব লোক একত্রে নামাজ পড়তে পারবে। হাসানের এসব কথা শুনে সকলেই বড় মাঠে ঈদের নামাজ আদায় করতে চাইলো। ইখওয়ানের বিরোধীরা এসব কথা জানতে পেরে নানান খারাপ কথা বলতে লাগলো। তারা বলল, খোলা মাঠে ঈদের নামাজ আদায় করা বেদয়াত। এটা মসজিদকে উজাড় করার সমতুল্য। কেউ কেউ বললো, এটা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু ইখওয়ানদের পেছনে সাধারণ মানুষের সমর্থন বেশী। ফলে সকলেই মিলে ঠিক করলো খোলা মাঠে ঈদের নামাজ আদায় করা হবে। হাসান প্রত্যেক ঈদে কায়রো গিয়ে পরিবার পরিজনের সাথে ঈদ করেন। সে কারণে তিনি এবারও কায়রো গেলেন। ইখওয়ানরা আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নত জিন্দা করার জন্য খোলা মাঠে ঈদের নামাজের ব্যবস্থা করলেন। এতে আরাইশ মসজিদের ইমাম শায়খ মুহাম্মদ মাদইয়াদ ঈদের নামাজ পড়ান। নবীজির পাক সুন্নত জিন্দা হওয়ায় সবাই খুশী। হাসান কায়রো থেকে ফিরে এসে সবাইকে হাসিখুশী দেখতে পেলেন। এরপর থেকে ইসমাঈলিয়ায় ঈদের নামাজ খোলা ময়দানে আদায় করা হতে থাকে।

সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার

রমজানের এক রাতে হাসান ইসমাঈলিয়ার শরীয়তি কাজীর বাড়ীতে গেলেন। সেখানে তখন পুলিশ ইন্সপেক্টর, সিভিল জজ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা বিভাগের ইন্সপেক্টর, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও আইনজীবীসহ শহরের গনমান্য লোকেরা ছিলেন। আলাপ-আলোচনার আসর বেশ জমে উঠেছে। এ সময় কাজী সাহেব চা আনতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে চা এল। হাসান ভাল করে দেখেন চায়ের পাত্র গুলো রূপার তৈরী। কিন্তু ইসলামে রূপা ও সোনার পাত্রে

খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ। কাজেই খাদেম যখন হাসানের কাছে রূপার পাত্রে চা নিয়ে এল তিনি তা নিলেন না। তিনি তাকে বললেন,

-কাঁচের পাত্রে আমার জন্য চা আন।

কাজী সাহেবও একথা শুনে ফেললেন। তিনি মৃদু হেসে বললেন,

-মনে হয় আপনি রূপার পাত্রে চা পান করবেন না?

-জ্বী হ্যাঁ। সব চে'বড় কথা আমরা এখন শরয়ী কাজীর বাসায় রয়েছি।

-দেখুন এই রূপার পাত্র ব্যবহার করা জায়েজ হবে কি না জায়েজ হবে সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। আর ইসলামের সব বিধান কি আমরা মেনে চলছি?

-না, তা পারছিনা।

-তবে এ বিষয়ে কেন কড়াকড়ি করবো?

এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু রূপার পাত্রে পানাহার করা সম্পর্কে যে বিধান আছে সে ব্যাপারে সবাই একমত। এ ব্যাপারে যে হাদিস আছে তা' সর্ববাদী সম্মত।

-হাদিসটি একটু বলুন।

-মহানবী (সঃ) বলেন, তোমরা সোনা আর রূপার পাত্রে খাবে না ও তাতে পান করবেনা। আরেকটা হাদিসে বলা হয়েছে, যে লোক সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করে সে পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়। সকলেই মনযোগের সাথে হাসানের কথা শুনছিলেন। কেউ কেউ বলতে চাইলেন,

-যেহেতু এসব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, কাজেই রূপার পাত্রে চা পানে আপত্তি করা ঠিক নয়।

এ সময় সিভিল জজ সাহেব কিছু বলতে চাইলেন। তাকে কথা বলতে দেখে অন্যান্য লোকেরা চুপ হয়ে গেলেন। তিনি কাজী সাহেবকে বললেন,

-এ বিষয়ে যখন মহানবীর হাদিস রয়েছে, তখন তা অবশ্যই পালন করতে হবে।

হাসান একথা শুনে খুশী হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন জজ সাহেবের আঙ্গুলে সোনার আংটি। তিনি তার দিকে তাকিয়ে বললেন,

-ভালই হল বিষয়টির ফয়সালা আপনিই করে দিলেন। এখন জনাব আরেকটি কথা।

-কি কথা বলুন।

-আপনার আঙ্গুলে সোনার আংটি। মহানবী পুরুষদের সোনার জিনিস ব্যবহার করতে মানা করেছেন। সোনার জিনিস পরা শুধু মাত্র মেয়েদের জন্য জায়েজ।

হাসানের কথা শুনে জজ সাহেব হেসে ফেলেন। তিনি বললেন,

-দেখুন আমরা মামলার রায় দেই নেপোলিয়ান কোড অনুযায়ী। আর কাজী সাহেব ফয়সালা করেন কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী। কাজেই আপনি আমাকে মাফ করুন। আর কাজী সাহেবকে ধরুন।

-ইসলামী আইন সব মুসলমানের জন্যই এসেছে। আর আপনি একজন মুসলমান। কাজেই নির্দেশটি আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

-ঠিক আছে। আমি আংটি খুলে ফেলছি।

আসরটি বেশ জমজমাট হয়ে ওঠছিল। এতে সকলেই অংশ গ্রহণ করেন। সব বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে যুক্তিতর্ক দিয়ে আলোচনা হল। পরে এসব বিষয় সাধারণ জনগনের কানে এল। তারা হাসানের সাহস এবং সর্বক্ষেত্রে সৎকাজের আদেশ আর খারাপ কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় খুশী হল। ইখওয়ানের প্রভাব মানুষের মধ্যে আরও বেড়ে গেল।

মিরাজ সম্পর্কে ইখওয়ান

হাসান এক মাহফিলে শবে মিরাজ সম্পর্কে একবার বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, মিরাজের সফর মহানবীর জন্য এক মহাসম্মান। ঐ পবিত্র রাতে তাঁর রুহ এমন এক স্তরে পৌঁছায় যখন তা নবীজীর পুরাদেহের ওপর বিজয় লাভ করে। হাসান কবি শাওকির কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, লোকেরা জিজ্ঞেস করে, তিনি তো সব রাসূলদের সেরা রাসূল। তাঁর ইসারার সফর দেহযোগে হয়েছে না রুহ যোগে? সন্দেহ নেই যে, দেহ ও রুহ উভয় ভাবেই তিনি এ সফর করেন। উভয়ই হয়েছে অশেষ পাক পবিত্র। উভয়ই ছিল আগাগোড়া রুহ, রুহনিয়্যাত এবং আলো।

মাহফিলের লোকজন হাসানের বক্তৃতা শুনে খুশী হয়। কিন্তু কিছু খারাপ লোক তার এ বক্তৃতা নিয়ে আজে বাজে কথা বলতে থাকেন। তারা বললো, ইখওয়ানরা মিরাজ মানে না। তারা বলে, এ ঘটনা মুজিজা নয়। মিরাজ হয়েছিল শুধু আত্মিকভাবে, দৈহিকভাবে নয়। ইখওয়ানের এ ধরনের আকীদা ভুল। কোন ইমাম এরকম আকীদা পোষণ করেননি।

ইখওয়ানের সদস্যরা এসব অপপ্রচারের জবাব দিতে চাইলেন। কিন্তু হাসান মানা করলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন আরেকটি মাহফিল করতে হবে।

সেখানে মহানবীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা হবে। মাহফিল হল। হাসান লোকজনের সামনে মহানবীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, মহানবী দৈহিক দিকে যেমন শ্রেষ্ঠ, নৈতিক দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ, আত্মিক দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ। আর ইবাদতের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ। হাসান রাসূল হিসেবেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে তার কত বড় মর্যাদা, সে সম্পর্কেও হাসান আলোচনা করেন। এ বক্তৃতার ফলে সকল মিথ্যা প্রচারের ফানুস চুপসে গেল। আর কেউ এ ব্যাপারে মুখ খুলতে পারল না।

হাসানের বিরুদ্ধে এক মাওলানা সাহেবের অভিযোগ

একবার দু'জন ইখওয়ান সদস্য হাসানের কাছে ছুটে এলেন। তারা হাসানকে বললেন,

-আমাদের নামে বদলাম ছড়ানো হচেছ।

-তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই।

-কিন্তু এতো বড় মারাত্মক ধরনের কথা হচেছ যে আমরা স্থির থাকতে পারছি না।

-যতবড় খারাপ কথাই বলা হোক না কেন মিথ্যা কখনই সত্য হবে না।

-আপনি যদি তাদের কথা শুনতেন তবে-

-যারা ইসলামের সহজ সরল পথে মানুষকে ডাকে তাদের নানান অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়। এ ব্যাপারে কোরআনের আয়াত রয়েছে।

-কোরআনের আয়াতও এ ব্যাপারে রয়েছে? কোন আয়াত দয়া করে একটু বলুন।

-সূরা আল ইমরানের ১৮৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, ধন সম্পদ আর জন সম্পদে অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং পূর্ববর্তী আহলে কিতাব আর মুশরিকদের কাছ থেকে তোমাদেরকে শুনতে হবে অনেক অশোভন উক্তি। আর তোমরা যদি ধৈর্য্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তা হবে একান্ত সৎ সাহসের কাজ।

-সব কিছুই বুঝলাম। কিন্তু এখন যেসব কথা ছড়ানো হচেছ তা শুনে আমরা চুপ থাকতে পারছিনা।

-কি সে সব কথা?

-আপনি ওয়াজে আমাদেরকে শেখাচেছন যে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমরা যেন আপনার ইবাদাত করি। আপনি বলছেন, ইখওয়ানদের বিশ্বাস করতে হবে,

হাসান মানুষ নন, তিনি নবী, ওলী বা পীরও নন। তিনি খোদা। তাকে পূজা করতে হবে।

-কে এসব কথা ছড়াচেছ?

-তিনি একজন আলেম। একটি ধর্মীয় পদেও তিনি দায়িত্ব পালন করছেন।

-তিনি এসব কথা কি নিজে নিজেই তৈরী করছেন?

-তিনি বলছেন আপনি নাকি এসব কথা বলেছেন। তাই তিনি সকলকে সে কথা শোনাচেছন।

হাসান তাদের সাথে আর কোন কথা বললেন না। তিনি ঐ মাওলানা সাহেবের দু'জন ঘনিষ্ট বন্ধুকে সাথে নিয়ে তার বাসায় গেলেন। মাওলানা সাহেব হাসানকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। হাসান তাকে অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু মাওলানা সাহেব তার কথার সঠিক জবাব দিতে পারলেন না। আসলে হাসানের প্রতি মানুষের ভক্তি আর ভালবাসা দেখে তার হিংসা হয়েছিল। এ কারণে তাকে ছোট করার জন্য মাওলানা সাহেব এরকম মিথ্যা কথা ছড়াচিছলেন। সব কথা শুনে সেই মাওলানা সাহেবের বন্ধু দু'জনতো মহা ক্ষেপে গেলেন। তারা তো গায়ে হাত তুলতে যাচিছলেন। কিন্তু হাসান বাধা দিলেন।

শেষে ঠিক হল একটা আলোচনা সভা হবে সেখানে ঐ মাওলানা সাহেব তার ভুল স্বীকার করবেন। বাচাঁর আর কোন উপায় না দেখে মাওলানা সাহেব তাতেই রাজী হলেন। এভাবেই এ অভিযোগের ইতি ঘটলো।

এক মাওলানা সাহেবের কাহিনী

ইখওয়ানের বিদ্যালয়ে উচচ শিক্ষিত ও ভাল ডিগ্রি প্রাপ্ত শিক্ষক নেয়া হয়। তারা ইখওয়ানের সদস্যদের মত ভাল লোক ছিলেন না। তাদের অনেকের মধ্যে সম্পদ বাড়াবার আর উঁচু পদ লাভের লোভ ছিল। কিন্তু তাদের চেয়ে যে আরো যোগ্য লোক থাকতে পারে এটা তারা বুঝতে চাননি। এ রকম একজন লোক ছিলেন একজন মাওলানা সাহেব। তিনি ভাল সাহিত্যিক ও ভাল বক্তা ছিলেন। তাকে আলহেরা স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। ইখওয়ান মসজিদে কোরআন হাদিসের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতেন। প্রত্যেকেই তাকে সম্মান করে। তিনি নিজেকে ইসমাঈলিয়ার ইখওয়ান প্রধান হবার কথা ভাবতেন।

হাসান সরকারী স্কুলের শিক্ষক। যেকোন সময় তাকে বদলি করা হতে পারে। এদিকে ইসমাঈলিয়ায় তার ৪ বছর কেটে গেছে। সেই মাওলানা সাহেব

ভুলে গেলেন যে তিনি নিজেও একজন শিক্ষক। বদলি বা চাকুরী হারানোর সম্ভাবনা তারও রয়েছে। তিনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রমান দেখাতে পারেননি। বরং ইখওয়ান কর্মপরিষদের কোন কোন সদস্যের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। যাতে তারা তাকে সমর্থন করেন। হাসান ইসমাঈলিয়ার ইখওয়ান প্রধান পদে শায়খ আলী আল জাদাদির নাম প্রস্তাব করেন। তিনি সবদিক থেকে উত্তম লোক। তিনি প্রথম দিককার ইখওয়ান। হাসানের প্রস্তাব গৃহীত হলো। সকলেই তা মেনে নিলেও ঐ মাওলানা সাহেব তা মেনে নিলেন না। তিনি তার সমর্থকদের নিয়ে এর বিরোধিতা শুরু করেন। ইখওয়ানের মসজিদ নির্মানে অনেক টাকা ব্যয় হয়। তখনও ৫০ পাউন্ড শোধ করা হয়নি। মাওলানা সাহেবের সমর্থকরা প্রচার করলেন হাসান এই ঋণের বোঝা রেখে ইসমাঈলিয়া ছেড়ে চলে যাচেছন। কে এই ঋণ শোধ করবে? হাসান এসব শুনে সবাইকে ডেকে ৫০ পাউন্ড নিজের বেতন থেকে শোধ দেয়ার দায়িত্ব নিলেন। একথা জানতে পেরে ইখওয়ানদের মধ্যে যারা ধনীলোক ছিলেন তারা নিজেরা চাঁদা উঠিয়ে সেই ৫০ পাউন্ড শোধ করে দিলেন। এরপরেও বিরোধীদের মুখ বন্ধ হলনা। তারা কিছু কাল্পনিক অভিযোগ ছাপিয়ে বিলি করলো। ইখওয়ানের পক্ষ থেকে তার জবাব দেয়া হয়। সাধারন মানুষ এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠে। ফলে ইখওয়ানের কাজ আরও বেড়ে গেল।

হাসান একদিন ফজরের নামাজের আগে মসজিদে আসছিলেন। সে সময় সেই মাওলানা সাহেবকে দেখলেন তার বাসায় আরো কয়েকজনকে নিয়ে বসে আছেন। তারা কি যেন গোপন আলোচনা করছেন। হাসানের বিরুদ্ধে কি কি কাজ করতে হবে মাওলানা সাহেব সে সব পরামর্শ দিচিছলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাসান তা শুনে বুঝতে পারলেন সব কিছু। তিনি সেই দিনই সেই মাওলানা সাহেবকে ডাকলেন। তার গোপন মিটিং এর কথা বললেন। শেষে সেই মাওলানা সাহেব আল হেরার চাকুরী ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তিনি ও তার সমর্থকরা আরেকটি বিদ্যালয় করার ঘোষনা দিলেন। শেষ পর্যন্ত তা আর হয়নি। এ দিকে মাওলানা সাহেব হাসানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। হাসানের নামে সমন এল। তিনি ইখওয়ানের সাথে যতদিন ছিলেন তার জন্য বেতন দাবী করলেন। হাসান তা' দিতে রাজী হলেন। কিন্তু মাওলানা সাহেব আবার ইখওয়ানের কাছ থেকে অনেক টাকা পয়সা নিয়েছিলেন। হাসান আদালতে তার প্রমান দেখালেন। ফলে বিচারক মামলা খারিজ করে দেন। মামলার খরচ মাওলানা সাহেবকে দেয়ার নির্দেশ দেন।

হাসানের বিয়ে

ইসমাঈলিয়ায় হাসান ৬ বছর ছিলেন। সেখানকার লোকজন তাকে খুবই ভালবাসতো। তাদের সুখ ও দুঃখের সময় তারা হাসানের কাছে যেতেন। তিনি সেখানকার সকলেরই আপনজন হয়ে ওঠেন। সেখানকার একজন ভাল লোক ছিলেন আলহাজ্ব হোসাইন ছুফী। হাসানের দাওয়াত আখলাকে মুগ্ধ হয়ে তিনি হাসানের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেন। বিভিন্ন কাজে তিনি হাসানের সাহায্য সহায়তা করতেন। তাঁর সন্তানরাও ছিল হাসানের ভক্ত। তিনি হাসানের সাথে নিজের মেয়ে লতিফাকে বিয়ে দিতে চাইলেন। পয়লা রমজান বিয়ে ঠিক হয়। ১৯৩২ সালে মসজিদে হাসানের বিয়ে হয়। সেটা ছিল ২৭ রমজান শবে কদর। বিয়ে সহজ সরল ও সাদাসিধে ভাবে হল। এজন্য কোন জাঁকজমক করা হয়নি। জিলকদ মাসের ১০ তারিখে হাসান স্ত্রীকে ঘরে তোলেন। স্ত্রী লতিফা খুবই পরহেজগার মহিলা। তিনি হাসানের যোগ্য স্ত্রী। নেককার এই মহিলা সুখ-দুঃখে সকল অবস্থায় হাসানের সাথে ছিলেন। অভাব অনটনের সংসারে থেকেও তিনি কখনো সেজন্য দুঃখ করতেন না। হাসানের মত তিনি অল্পতেই খুশী থাকতেন। তাঁদের ৫ মেয়ে আর এক ছেলে হয়। মেয়েদের নাম- সানা, ওফা, রাজা, হাজেরা ও ইসতিশহাদ এবং ছেলের নাম আহমদ সাইফুল ইসলাম।

কায়রো ও সারাদেশে ইখওয়ান প্রসার

বিয়ের পর হাসান ভাবলেন এবার তিনি ইসমাঈলিয়া ছাড়বেন। কেননা এখানে সবাই ইখওয়ানে যোগ দিয়েছে। আন্দোলনের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠেছে। এখন দেশের অন্যান্য স্থানেও ইখওয়ান গড়ে তুলতে হবে। এজন্য তিনি মনে মনে বদলি হতে চাচ্ছিলেন। এ বিষয়ে বন্ধুদের সাথে আলাপ করলেন। আল্লাহ্ তার এই প্রিয় বান্দার মনের ইচছা পূরন করলেন। ১৯৩৩ সালের অক্টোবরে তাঁকে কায়রোতে বদলি করা হয়। হাসান কায়রোতে এলেন। এর ফলে ইখওয়ানের সদর দফতরও কায়রোতে স্থানান্তরিত হল। কায়রোতে ইখওয়ানের কাজ বাড়তে থাকে। ১৯৩৪ সালের মধ্যে মিসরের ৫০টি বেশী শহর আর নগরে ইখওয়ানের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। এসব স্থানে বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। এছাড়া শিল্প কারখানাও স্থাপন করা হয়। মাহমুদিয়ায় একটা কাপড়ের কল ও একটা কার্পেট কারখানাও স্থাপন করা হয়।

সরকারের কাছে পত্র

১৯৩৫ সাল থেকে হাসান দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সরকারের কাছে পত্র দিতে থাকেন। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপদেশ দেন। ১৯৩৮ সালে তিনি লেখেন,

ইখওয়ান আল্লাহর কেতাব আর রাসূলের সুন্নাহ মত চলতে চায়। ইখওয়ান বুঝতে পেরেছে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসাই হচেছ সকল কল্যাণের উৎস। ইখওয়ান শাসননীতির সংস্কার চায়। ইখওয়ান শরীর চর্চা করে এবং অন্যান্য খেলোয়াড় দলের সাথে ম্যাচও খেলে। ইখওয়ানের ক্লাব ও কেন্দ্রে জ্ঞান ও বিবেককে চাঙ্গা করা হয়। ইখওয়ান অর্থনৈতিক কোম্পানী। কারণ ইসলাম অর্থনীতির ব্যাপারেও নির্দেশ দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ইখওয়ান

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল। এ সময় বিশ্ব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এদিকে হাসান ইখওয়ানের দাওয়াতকে আরো বাড়াতে থাকেন। এর ফলে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় ও আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দলে দলে ইখওয়ানে যোগ দেয়। নানান পেশা আর শ্রেণীর লোক ইখওয়ানের দাওয়াতে সাড়া দেয়। ফলে কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী,শিল্পপতি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, আইনজীবী ও চাকুরীজীবীসহ সব ধরনের লোকই ইখওয়ানে শরীক হয়।

ইখওয়ানের উপর নির্যাতন

মিশরের রাজা ফারুক নামে মাত্র শাসক ছিলেন। আসল ক্ষমতা ছিল ইংরেজদের হাতে। দেশের ব্যবসা বানিজ্যসহ সব অর্থনৈতিক শক্তি ইহুদীদের কজায় ছিল। এই খৃষ্টান আর ইহুদীরা ইখওয়ানের শক্তিকে বাড়তে দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা প্রধানমন্ত্রী হুসাইন সিররি পাশার উপর চাপ দিতে থাকে। তাদের চাপের মুখে সিররি পাশা ইখওয়ানের দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ করে দেন। মাসিক পত্রিকা আল মানারও নিষিদ্ধ করা হয়। ইখওয়ানের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইখওয়ানের কোন খবর ছাপানো নিষিদ্ধ করা হয়। তাদের সভা সমাবেশ করার অনুমতি দেয়া হয় না। হাসানকে কায়রো থেকে অন্য জায়গায় বদলি করা হয়। সে সময়ও তিনি শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করতেন। এসব বিষয়ে মিসরের পার্লামেন্টে আলোচনা হয়। তীব্র প্রতিবাদের মুখে তাকে পুনরায় কায়রোতে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু কায়রো পৌঁছামাত্র হাসানকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। নাহাশ পাশা প্রধানমন্ত্রী হলে ইখওয়ানের ওপর জুলুম বন্ধ হয়। ১৯৪৪ সালে আহমদ মাহের পাশা প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি আবার ইখওয়ানের উপর কড়াকড়ি করতে থাকেন। ইংরেজদের চাপের মুখে তিনি জার্মানী ও ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহনের ঘোষণা দেন। ইখওয়ান অযথা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বিরোধীতা করে। এ সময় আহমদ মাহের পাশা আততায়ীর

হাতে নিহত হন। নোকরাশি পাশা নয়া প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি হাসানসহ ইখওয়ান নেতাদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠান।

আজাদী আন্দোলনের ডাক

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হয়। যুদ্ধের সময় ইংরেজরা ওয়াদা করে, মিসরীয়রা ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধে শরীক হলে বৃটেন মিসরকে স্বাধীনতা দেবে। যুদ্ধ শেষে হলে ইখওয়ান স্বাধীনতা দাবী করে ব্যাপক গণ আন্দোলন সৃষ্টি করে। তারা ইংরেজদের ওয়াদা পূরনেরও দাবী জানায়। ১৯৪৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ইখওয়ানের এক গুরুত্বপূর্ন সভা হয়। এরপর নতুন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ইখওয়ানের সমর্থন বাড়তে থাকে। এসময় আল ইখওয়ান নামে নতুন একটি দৈনিক পত্রিকাও বের হয় এবং বিভিন্ন স্থানে সামরিক প্রশিক্ষন কেন্দ্র খোলা হয়। হাসান ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় সভাপতি বা মুর্শিদে আম হন। তাকে আজীবন নেতা নির্বাচিত করা হয়। এ সময় মিসরেই ইখওয়ানের কর্মী হয় ৫ লাখ লোক। সারা দেশে ২ হাজার শাখা খোলা হয়।

হাসান ইংরেজদের ওয়াদাভঙ্গের কারণে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তার প্রচেষ্টায় সারাদেশে আজাদীর আগুন জ্বলে ওঠে। নোকরাশি পাশা পদত্যাগ করেন। তখন ইসমাঈল সেদকি পাশা সরকার গঠন করেন। তিনি ইখওয়ানের লোকজনকে গ্রেফতার করতে থাকেন। কিন্তু তাকে পদত্যাগ করতে হয়। আবার নোকরাশি পাশা ক্ষমতায় আসেন। ১৯৪৭ সালের ১২ ডিসেম্বর । আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইখওয়ান বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে। হাসান এ মিছিলের নেতৃত্ব দেন। তিনি মোটর গাড়ীতে বসে মাইক যোগে নির্দেশ দেন। ১৯৪৮ সালের ৬ মে। হাসান ইখওয়ানের শীর্ষ পরিষদের বৈঠক করেন। এতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে ফিলিস্তিনকে রক্ষা করার সম্ভাব্য সব উপায় অবলম্বনের জন্য মিসর ও অন্যান্য আরব দেশের সরকারগুলোর প্রতি জোর দাবী জানানো হয়।

ইখওয়ানকে বেআইনী ঘোষণা

এ সময় ইংরেজরা গায়ের জোরে আরবদের বুকে ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করে। শুরু হয় যুদ্ধ। হাসান হাজার হাজার ইখওয়ান স্বেচছাসেবককে ফিলিস্তিনে পাঠান যুদ্ধ করতে। এই যুদ্ধে ইখওয়ানরা খুবই বীরত্ব দেখায়। এর ফলে ইংরেজ ও ইহুদীরা ভয় পেয়ে যায়। ইংরেজদের দালাল নোকরাশি পাশা ১৯৪৮ সালের ৮ ডিসেম্বর জরুরী আইনের ৭৩ ধারায় ইখওয়ানকে বেআইনী ঘোষণা করেন। ইখওয়ানের সব কেন্দ্র ও দফতর বন্ধ করে দেয়া হয়। হাজার হাজার ইখওয়ান

যুবককে জেলে পাঠান হয়। তাদের ওপর ভয়াবহ জুলুম নিপীড়ন চালানো হয়। এ সময় এক যুবক নোকরাশি পাশাকে খুন করে। ফলে ইবরাহীম আব্দুল হাদী প্রধানমন্ত্রী হন।

আল্লাহ্‌র রাহে শহীদ হাসানুল বান্না

তার আমলে ইখওয়ানের মুর্শিদে আম হাসানকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী। হাসান একটি স্থানে দাওয়াতের কাজ করে মোটর যোগে ফিরছেন। এ সময় সরকারের নিয়োজিত সশস্ত্র লোকেরা প্রকাশ্য রাজপথে তাকে লক্ষ্য করে গুলী করে। গুলী বিদ্ধ হয়ে হাসান লুটিয়ে পড়েন। হাসাপাতালে নেয়ার পথে তাঁর রুহ মহান আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে যায়। তিনি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হলেন। এ সময় তার বয়স মাত্র ৪৩ বছর। তিনি খুব কম সময়ের মধ্যে মিসরসহ গোটা আরব জাহানে তোলপাড় সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তার দরদ ভরা দাওয়াতের কারণে ২০ লাখ মিসরীয় নাগরিক ইখওয়ানে যোগ দেন। সারা দেশে ইখওয়ানের দু'হাজারের বেশী শাখা গড়ে ওঠে। মিসরের বাইরে সুদান, সিরিয়া, ইরাক ও তুরস্কে পর্যন্ত ইখওয়ানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

হাসান একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। দিনের বেলা মানুষকে খোদার পথে দাওয়াত দিতেন আর সারা রাত আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন আর মানুষের হেদায়েতের জন্য কান্নাকাটি করতেন। হাসানের শাহাদাত বৃথা যায়নি। তার পথ ধরে বিপ্লবী কাফেলা এগিয়ে চলেছে। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচেছ ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আমাদের চরম লক্ষ্য, রাসূল (সাঃ) আমাদের নেতা, আল কুরআন আমাদের সংবিধান, জিহাদ আমাদের পথ, আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যু আমাদের পরম কাম্য।

হাসানুল সম্পর্কে মন্তব্য

হাসানের পুরা নাম ইমাম হাসানুল বান্না। তাঁর ছোট ভাই ছিলেন আব্দুর রহমান আল বান্না। তিনি বড় ভাই হাসানের চেয়ে দু'বছরের ছোট। উভয়ে একসাথে লেখা পড়া করেন এবং ইসলামী আন্দোলনে এক সাথে কাজ করেন। ছোট ভাই আব্দুর রহমান লিখেছেনঃ ছোট বেলা থেকেই বড় ভাই হাসান নামাজ রোজা ও জিকরে মশগুল থাকতেন। ফকির দরবেশ আর নেককারদের সাথে ছিল হাসানের অগাধ ভালবাসা। ইখওয়ানের অন্যতম নেতা আমিন ইসমাইল বলেন, একবার হাসানের সাথে তিনি এক দর্জির কাছে গেলেন। দর্জি তৈরী করা জামা এনে দিয়ে তিন মিসরী পাউন্ড মজুরী দাবী করে। হাসান তাকে পাঁচ পাউন্ড দিয়ে জামা নিয়ে আসেন। বাকী ২ পাউন্ড তিনি আর ফেরৎ নেননি। সামনে

একজন অসহায় ভিক্ষুককে দেখে হাসান তাকে কিছু দিতে চাইলেন। কিন্তু তার কাছে আর কিছুই নেই। এ কারণে সাথী আমিন ইসমাইলকে এক রিয়াল দিতে বললেন। এরকমই উদার মন ছিল তার।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলা কালে ইংরেজরা হাসানকে কয়েক হাজার পাউন্ড দিতে চেয়েছিল। এর বিনিময়ে তারা হাসানের সমর্থন কামনা করছিল। কিন্তু তিনি ইংরেজদের টাকা নেননি। এমনকি ইংরেজরা হাসানকে আরো বেশী টাকা পয়সা দেয়ারও লোভ দেখায়। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি।

ইখওয়ানের বহু কোম্পানী ছিল। হাসান সেগুলোর পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। কোম্পানীর কাজে তাকে সময় দিতে হত। এজন্য তিনি ভীষণ পরিশ্রম করতেন। কোম্পানী থেকে তাকে ভাতা দেয়ার কথা উঠল। কিন্তু তিনি তা নেননি।

হাসানুল বান্নার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

তিনি সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। কায়রোতে তাঁর নিজের কোন বাড়ী ছিলনা। বরং পুরাতন ধাঁচের এক মহল্লায় জরাজীর্ণ এক ভাড়া বাড়ীতে তিনি থাকতেন। বাড়ীর ভাড়া ছিল মাসে ১ পাউন্ড ৮০ ক্রোশ। তার ঘরের আসবাবপত্র ছিল নিতান্তই মামুলী ধরনের। তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি সস্তা দামের লম্বা জামা পরতেন। জামার উপরে আবা গায়ে দিতেন। মাথায় পাগড়ী বাঁধতেন। তার চেহারা উজ্জ্বল গৌরবর্ণের। চেহারা থেকে নূরের আভা ফুটে বের হত। কথাবার্তায় কোন কৃত্রিমতা ছিল না। সাদাসিধা ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করতেন। কথায় কথায় তিনি কুরআনের আয়াত উল্লেখ করতেন। তিনি কোরআনে হাফেজ ছিলেন। হাসান স্বভাবে ছিলেন একজন দরবেশ। খাবার জন্য যা কিছু মিলতো তা'ই তিনি খেয়ে নিতেন। পরার জন্য যা মিলতো তাই পরতেন। অফিসের সহকর্মীদের সাথে তিনি মধুর ব্যবহার করতেন। ফলে সকলেই তাকে ভালবাসতো। সফরসঙ্গী আমিন ইসমাঈল বলেন, হাসান আমার কাজ ভালভাবে পরীক্ষা করতেন। ভুল থাকলে সংশোধন করে দিতেন। আমার ঘরে নতুন শিশুর আগমন হলে তিনি দেখতে আসতেন। আমি অসুস্থ হলে তিনি সেবা করতেন। আমার কষ্ট হলে আমার বাসায় এসে সান্তনা দিতেন। অথচ আমি অফিসের একজন কেরানী আর তিনি এতবড় লোক। তিনি খুব কমই ঘুমাতেন। খুব সামান্য খাবার খেতেন।

চির প্রতিবাদী হাসানুল বান্না

কায়রোতে ইখওয়ানরা একবার মিছিল করে ফিলিস্তিনী ভাইদের সাথে সহযোগিতা করার দাবী জানাতে থাকে। এ সময় হাসান মিছিলে নেতৃত্ব

দিচিছলেন। মিছিল আল আতাবা আল কাদারা নামক স্থনে পৌছলে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর গুলী চালায়। হাসান সামনে এগিয়ে গিয়ে গুলী চালাতে পুলিশকে নিষেধ করেন। এ সময় গুলী তার হাতে লাগে। ফলে হাত থেকে রক্ত ঝরতে থাকে।

হাসানুল বান্নার ভবিষ্যদ্বানী

সফরে গেলে তিনি মসজিদে থাকতেন। আর রমজানের সময় সফরে থাকতেন। মসজিদে খেজুর ও পানি দিয়ে ইফতার করতেন। হাসান খাঁটি আল্লাহ্‌ওয়ালা ছিলেন। তিনি খুবই বিজ্ঞ ও দূরদর্শী ছিলেন। হাসান ইখওয়ানদের যেসব কথা আগে ভাগে বলেছিলেন পরবর্তীতে তাই সত্যে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনো শুরু হয়নি। একবার তিনি বললেন, যেদিন অধিকাংশ মানুষ ইওয়ানদের আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবে সেদিন তাদের পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধীতা ও কঠোর শত্রুতা করা হবে। সে সময় ইখওয়ানদের অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে। সত্যের পতাকাবাহী হওয়ার দাবী সে সময় যথার্থ হবে। তখন দাওয়াতের জন্য কোরবানী দিতে হবে। এজন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হতে হবে। সরকারী আলেমরাও ইখওয়ানের বিরোধীতা করবে। শাসক শ্রেণী, নেতা আর হর্তা কর্তারা ইখওয়ানদের দেখে জ্বলে পুড়ে মরবে। সরকার বাধা দেবে। দাওয়াতের আলো নেভানোর জন্য তারা সব রকম অস্ত্র ব্যবহার করবে। দাওয়াত সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করবে। যেকোন দোষ এখওয়ানের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করবে। এরকম অবস্থায় ইখওয়ানদের ধৈর্যের সাথে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সে সময় ইখওয়ানদের জেলে পাঠানো হবে, বাড়ী ঘর থেকে বহিষ্কার আর দেশান্তরিত করা হবে। তাদের জমি জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে। গৃহ তল্লাশি করা হবে। হাসান যেসব কথা বলেছিলেন পরবর্তীকালে তাই ঘটে ছিল।

তিনি কালামে পাকের আয়াত উল্লেখ করে বলেন, লোকেরা কি মনে করেছে যে 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? তাদেরকে কোন পরীক্ষা করা হবে না? আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তিনি মুজাহিদদের সাহায্য করবেন এবং যারা ভাল কাজ করে তাদেরকে শুভ পরিনাম দান করবেন।

মানুষ গড়ার কারিগর হাসানুল বান্না

হাসানুল বান্না বই পুস্তক রচনায় সময় দিতে পারেননি। তিনি গোটা জীবন মানুষের চরিত্র গঠনের লক্ষে দাওয়াতের কাজে ব্যয় করেন। তিনি কোন লেখক

বা সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারী। তিনি একদল লোককে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলেন। তাদের দ্বারা ইসলামী আন্দোলনের কাজ করতে থাকেন। একবার এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আচছা আপনি বইপুস্তক রচনা করেননা কেন? জবাবে তিনি বলেন, আমি মানুষ রচনা করি। অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। মানুষ গড়ার কারিগর।

হাসানের স্ত্রীও স্বামীর মতই নেককার মহিলা ছিলেন। যেদিন হাসান শহীদ হন সেদিন তার শেষ কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। মা এ মেয়ের নাম রাখেন ইসতিশহাদ বা নিশান। হাসানের একমাত্র পুত্র আহমদ সাইফুল ইসলাম চিকিৎসক ছিলেন। তার চাল-চলন আর স্বভাব চরিত্র পিতা হাসানের মতই সুন্দর ছিল। ছাত্র জীবনে সাইফুল ইসলাম সব সময় প্রথম হতেন। কায়রোর দারুল উলুম থেকে একই বছরে তিনি দু'টি ডিগ্রী লাভ করেন।

মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের সেদেশে ফেরাউনের শাসন কায়েমের চেষ্টা করছিলেন। ইখওয়ানরা তার বিরোধীতা করেন। ফলে তিনি ইখওয়ানদের জেলে পাঠান। এ সময় হাসানুল বান্নার পুত্র আহম্মদ সাইফুল ইসলামকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। ইসলামী দাওয়াতের কাজ করার অপরাধে তাঁকে ২৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। কিন্তু এতে দমে যাননি হাসানুল বান্নার সুযোগ্য পুত্র সাইফুল ইসলাম। তিনি ইখওয়ানের আলোর মশাল নিয়ে শত নির্যাতনের মুখেও এগিয়ে চলেছেন সম্মুখের পানে। তার সামনে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একদিন তিনি পৌছতে পারবেন সেই মঞ্জিলে। সেদিন মিসরসহ সারা দুনিয়াতে কায়েম হবে ইসলামী শাসন। মানুষ লাভ করবে শান্তি আর নিরাপত্তা।

যবনিকা

আরজু পাবলিকেশন্স

পরিবেশনায়

ঢাকা বুক কর্ণার

৬০/ডি পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

মোবাইল : ০১৭১১০৩০৭১৬